পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

দুর্নীতির পথে
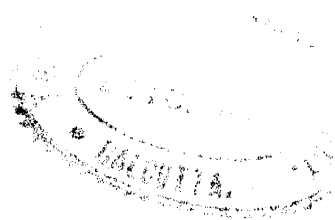
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

তরুণ সাহিত্য মন্দির,
১৬, গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা

অনুবাদক—

বিনয়কৃষ্ণ সেন

প্রকাশক—

বিজয়রত্ন সেন

চৈত্র, ১৩৩
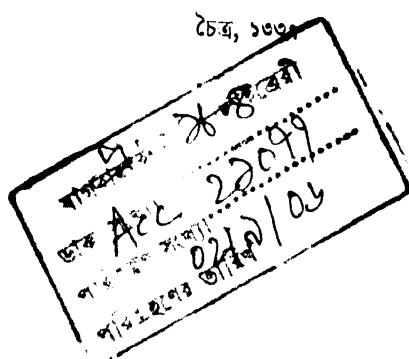
মূল্য ছয় আনা

প্রকাশ প্রেস
৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

নিবেদন

'দুর্নীতির পথে' মহাত্মা গান্ধী লিখিত Towards Moral Bankruptcy'র বাংলা অনুবাদ। গান্ধীজীর লেখা Self-Restraint vs. Self-Indulgence নামক ইংরাজী বইএর পরিশিষ্টের সমস্ত লেখার অনুবাদও ইহাতে দেওয়া হইল। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ পুস্তক প্রণয়নে বিশেষ সাহায্য করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

কলিকাতা

বিনয়কৃষ্ণ সেন

সূচী

দুর্নীতির পথে

—০:*:০—

প্রথম অধ্যায়

বিষয় প্রবেশ

কৃত্রিম উপায়ে সন্তানবৃদ্ধি বন্ধ করা সম্বন্ধে যেসব লেখা দেশী সংবাদ পত্রে বাহির হইতেছে, তাহা কাটিয়া সহৃদয় বন্ধুগণ আমার নিকট পাঠাইতেছেন। যুবকদের সহিত তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক পত্র-ব্যবহার আমি করিতেছি। পত্রলেখকগণ যেসব প্রশ্ন তুলিয়াছেন, আমি তার অতি অল্প কয়েকটির আলোচনা এখানে করিতে পারিব। আমেরিকার বন্ধুগণ আমার নিকট এ সম্বন্ধীয় সাহিত্য পাঠাইতেছেন এবং কৃত্রিম উপায়ের বিরুদ্ধে মত দিয়াছি বলিয়া কেহ কেহ আমার উপর চটিয়াছেন। তাহারা দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, আমার ন্যায় নানা বিষয়ে উন্নত সংস্কারকের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সেকেলে ধারণা থাকা ঠিক নহে। ইহাও দেখিতেছি যে, কৃত্রিম উপায়ের পক্ষপাতী লোকের ভিতর সব দেশের কতকগুলি চিন্তাশীল নর-নারীও আছেন।

এসব দেখিয়া মনে হইল, কৃত্রিম উপায়ে সন্ততিনিরোধের পক্ষে নিশ্চয়ই কিছু জোরের যুক্তি আছে এবং এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী বলিতে হইবে। যখন আমি এই

সমস্যার কথা ও এই বিষয় সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠকরার কথা ভাবিতেছিলাম, তখন একখানা ইংরেজী বই আমার হাতে পড়ে। ইহাতে সুন্দররূপে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে ঠিক ইহাই আলোচিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত পালবুরো নামক এক ব্যক্তি ফরাসী ভাষায় লিখিয়াছেন। বইটির নাম 'ভ্রষ্টাচার'।

এই বই পড়িয়া মনে হইল, গ্রন্থকারের অভিমত সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, কৃত্রিম উপায় সমর্থন করিয়া যেসব বই প্রকাশিত হইয়াছে তার ভিতর হইতে প্রধান প্রধান বই পড়িতে হইবে। এ জন্য 'ভারত সেবক সমিতি'র (Servants of India Society) নিকট যে সব বই ছিল তাহা আনিয়া পড়িলাম। কাকা কালেলকর ইহা আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি আমাকে হ্যাভলক্ এলিসের একখানা বই দিয়াছেন এবং একজন বন্ধু 'দি প্র্যাকটিশনার' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা দিয়াছেন—এই সংখ্যায় বিখ্যাত চিকিৎসকদের অভিমত সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বুরোর সিদ্ধান্তের সত্যতা পরীক্ষার জন্য, যাহারা চিকিৎসক নহেন তাহাদের পক্ষে যতটা সম্ভব, আমি এই বিষয়ের সাহিত্য সংগ্রহ করিতে ততটা চেষ্টা করিয়াছি। বৈজ্ঞানিকদের ভিতর কোনো প্রশ্ন লইয়া আলোচনা হইলে প্রায়ই দেখা যায় যে, ইহার দুটি দিক আছে এবং দু'দিকেই যথেষ্ট বলার আছে। এ জন্য বুরোর গ্রন্থ পাঠকদের নিকট উপস্থিত করার পূর্ব্বে কৃত্রিম উপায়ের পক্ষপাতীদের সমস্ত যুক্তি জানার ইচ্ছা হইয়াছিল। অনেক চিন্তার পর আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, অন্ততঃ পক্ষে ভারতবর্ষে কৃত্রিম উপায় প্রবর্ত্তনের কোনো প্রয়োজন নাই। যাহারা ভারতে ইহা প্রচার করিতে চাহেন, তাহারা হয় ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানেন না, না হয় জানিয়াও তাহা গ্রাহ্য

করেন না। কিন্তু যদি প্রমাণ করা যায় যে, কৃত্রিম উপায় পাশ্চাত্য দেশেরও অনিষ্টকর, তবে ভারত সম্বন্ধে ইহা আলোচনা করা দরকার হইবে না।

দেখা যাক্, বুরো কি বলেন। তিনি ফ্রান্স্ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, কারণ ফ্রান্সের অর্থ অনেক। ইহা পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশ। যদি ফরাসী দেশে এই প্রণালী সফল না হইয়া থাকে, তবে ইহা কোথায় সফল হইবে?

'অসফলতার' অর্থ লইয়া মতভেদ হইতে পারে। সে জন্য এখানে যে অর্থে ইহা ব্যবহার করিয়াছি তাহা বলিব। যদি প্রমাণ করা যায় যে, কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের ফলে লোকের নীতিজ্ঞান শিথিল হইয়াছে, ব্যভিচার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং স্বাস্থ্য রক্ষা ও অর্থনৈতিক কারণে গর্ভ-নিরোধের জন্য ইহার ব্যবহার না করিয়া শুধু পাশববৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য লোকে ইহার আশ্রয় লইতেছে, তবে নিশ্চয়ই বুঝান হইবে যে, এই প্রণালী অকৃতকার্য্য হইয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা মধ্যম পন্থা। উৎকৃষ্ট নৈতিক সিদ্ধান্ত অনুসারে কৃত্রিম উপায়ে সন্তান-নিয়ন্ত্রণ করা সর্ব্বাবস্থায় দোষনীয়। যেমন শরীর রক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন নর-নারীর আহার করা উচিত নহে, তেমনি সন্তান লাভের উদ্দেশ্য ভিন্ন কামেন্দ্রিয় চরিতার্থ করার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় আর এক শ্রেণীর লোক আছে। তাহারা বলে, 'নীতি বলিয়া কোনো-কিছু নাই, থাকিলেও ইহার অর্থ সংযম নহে; ইহার অর্থ খুব বিষয়ভোগ করা; ইন্দ্রিয়সেবাই জীবনের উদ্দেশ্য; একটু নজর রাখিতে হইবে ইন্দ্রিয়-সেবা করিতে করিতে শরীর নষ্ট না হয়, কারণ ইহাতে ভোগে ব্যাঘাত পড়িবে।' এইরূপ উৎকট ভোগপন্থী লোকের জন্য বুরো তাহার পুস্তক লেখেন নাই, কারণ বুরো টম্‌ম্যানের যে কথাটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার

পুস্তক শেষ করিয়াছেন তাহা এই "যাহারা সংযমী ভবিষ্যৎ সেই সব জাতির হাতে।"

পুস্তকের প্রথম ভাগে শ্রীযুক্ত বুরো যে সব ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িলে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। মানুষের পাশববৃত্তির খোরাক যোগাইবার জন্য ফরাসী দেশে কিরূপ বিরাট প্রতিষ্ঠান সকল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কথা ইহাতে আছে। কৃত্রিম উপায় সমর্থন-কারীদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় যুক্তি এই যে, ইহার দ্বারা গর্ভপাত ও ভ্রূণহত্যা বন্ধ হয়। তাহাদের এ কথাও ঠিক নহে। শ্রীযুক্ত বুরো বলেন, 'গত পচিশ বৎসর ধরিয়া ফরাসী দেশে নির্ভ-নিরোধের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বে, সেখানে অপরাধ-মূলক গর্ভপাতের সংখ্যা কমে নাই, বরং ইহা বাড়িতেছে। ফ্রান্সে বৎসরে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার হইতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার পর্য্যন্ত গর্ভপাত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বে সাধারণে ইহাকে যেরূপ ভীতির চোখে দেখিত, এখন তা দেখে না।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবিবাহিতদের ভিতর ভ্রষ্টাচার

শ্রীযুক্ত বুরো বলেন, "গর্ভপাতের সহিত শিশু হত্যা, ব্যভিচার এবং এইরূপ আরও অনেক পাপ বাড়িয়াছে। এ সব শুনিলে ছাতি ফাটিয়া যায়। শিশুহত্যা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই, তবু এইটুকু বলিব, অবিবাহিত মাতাদের গর্ভ-নিরোধ ও গর্ভপাতের নানা সুবিধা দেওয়া সত্ত্বে, শিশুহত্যা অপরাধ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে তথাকথিত সম্মানী লোকদের মনে দণ্ড দেওয়া অথবা ভৎর্সনা করার কথা জাগে না এবং আদালত হইতে এই সব ব্যাপারে প্রায়ই 'বে-কসুর খালাস' রায় দেওয়া হইয়া থাকে।"

অশ্লীল সাহিত্যের প্রচার কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, বুরো এক অধ্যায়ে শুধু তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্য, নাটক ও চিত্রাদি লোকের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্য দান করিবে। কিন্তু অশ্লীল সাহিত্য ও চিত্রাদি বিক্রয় করিয়া অর্থশোষণের উদ্দেশ্যেই অনেকগুলি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র এই সাহিত্যের চাহিদা আছে, ইহা বিক্রয় হইতেছে এবং ইহার চর্চ্চা হইতেছে। খুব বুদ্ধিমান লোকে এই সাহিত্য-ব্যবসায় করিতেছে এবং কোটি কোটি টাকা এই কারবারে খাটিতেছে। লোকের মনের উপর এই সাহিত্যের ভয়ানক বিষাক্ত প্রভাব পড়িয়াছে। এই সব পুস্তক পাঠ করার সময় তাহারা মনে মনে এক নূতন ব্যভিচারী দুনিয়া ভোগ করে—এই সাহিত্যই সেই কল্পনা-রাজ্য সৃষ্টির মূলে আছে।

তারপর বুরো রুইসনের করুণাপূর্ণ এক লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"এই সব অশ্লীল সাহিত্য লোকের মহা অনিষ্ট সাধন করে। ইহার বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া বলা যায় যে, লক্ষ লক্ষ লোকে এগুলি পড়ে। পাগলা-গারদের বাহিরেও কোটি কোটি পাগল বাস করে। পাগল যেরূপ তাহার এক নিরালা দুনিয়ায় বাস করে, এই সব বই পড়ার সময় লোকে সেইরূপ এক নূতন দুনিয়ায় বাস করে এবং তখন জগতের কথা তাহাদের মনে হয় না। অশ্লীল সাহিত্যের পাঠকগণ কল্পনার সাহায্যে ইন্দ্রিয়-ভোগের স্বপ্ন-রাজ্যে বাস করে এবং নিজেদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়।"

ইহার একমাত্র কারণ লোকের এই ধারণা আছে যে, ইন্দ্রিয়সেবা করা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং বিষয়-ভোগ না করিলে মানুষের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। যখন এরূপ ধারণা কোনো লোককে পাইয়া বসে, তখন তাহার সব চিন্তার ধারা উল্টাইয়া যায়। যাহাকে সে এককালে পাপ মনে করিত, তাহাকে সে পুণ্য মনে করে এবং নিজের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে।

কিরূপে দৈনিক সংবাদ-পত্র, মাসিক পত্রিকা, উপন্যাস, চিত্র ও নাট্যশালা প্রভৃতি এই মনুষ্যত্ব-নষ্টকারী রুচির খোরাক ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে যোগাইতেছে তাহা তিনি বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইয়াছেন।

অবিবাহিতদের মধ্যে যে নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে, তাহা বলার পর শ্রীযুক্ত বুরো বিবাহিত জীবনের ভ্রষ্টাচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "সম্ভ্রান্ত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও কৃষকদের অধিকাংশ বিবাহের মূলে আছে বৃথা অভিমান, চাকুরী অথবা সম্পত্তির লোভ, বৃদ্ধ বয়সে অথবা অসুখের সময় দেখাশুনার জন্য একজন লোকের

বন্দোবস্ত করিয়া রাখা, বাধ্যতামূলক সৈন্যসংগ্রহের সময় নিজের স্থলে আর একজনকে (পুত্রকে) সৈন্যদলে ভর্ত্তি করার সুবিধা পাওয়ার আশা, অথবা এইরূপ অপর কোনো স্বার্থ-চিন্তা। যে পাপ-পথে চলিতে চলিতে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তার পরিবর্ত্তে নূতন রকমে ইন্দ্রিয়ভোগ করার জন্যও তাহারা বিবাহ করে।

শ্রীযুক্ত বুরো তার পর হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সব বিবাহের ফলে ব্যভিচার কমে নাই বরং বাড়িয়াছে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই অধঃপতনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে—এই আবিষ্কারের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতা রোধ করা নহে, ইহার উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির ফল এড়ান। যে অধ্যায়ে পরস্ত্রীগমন ও তালাকের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা আছে, সে অধ্যায় সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না—গত ২০ বৎসরে এই সংখ্যা দ্বিগুণের বেশী বাড়িয়াছে। 'পুরুষের সমান অধিকার নারীর থাকা চাই' এই কথা বলিয়া যাহারা নারীকে ইন্দ্রিয়সেবার স্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতী, আমি তাহাদিগকে কিছু বলিব। গর্ভ-নিরোধ এবং গর্ভপাত করিবার জন্য যে সব তথাকথিত উন্নত প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা স্ত্রী-পুরুষ সকলকে সব রকম নৈতিক বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছে। এ জন্য বিবাহের কথায় লোকে যদি হাসে, তবে ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? বুরো এক জনপ্রিয় লেখকের এই লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"আমার মতে বিবাহপ্রথা বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। যখন মানুষ আরও ন্যায়পরায়ণ ও বুদ্ধিমান হইবে তখন তাহারা এই কুপ্রথা নিশ্চয়ই লোপ করিবে। * * * কিন্তু পুরুষ এত মূর্খ এবং নারী এত ভীরু যে কোনো মহান আদর্শের জন্য তাহারা উৎসাহের সহিত কিছু করিতে চায় না।"

যে সব প্রণালীর কথা বুরো উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ফল এবং

যে যুক্তির দ্বারা এই সব প্রণালী সমর্থন করা হয়, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে সব পরীক্ষা করার পর বুরো বলিতেছেন :—"এই ভ্রষ্টাচার আমাদিগকে এক নূতন দিকে লইয়া যাইতেছে। সে কোন্ দিক? আমাদের ভবিষ্যৎ আলোকময়, না অন্ধকারময়? আমরা উন্নত হইব, না অবনত হইব? আমরা আত্মার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইব, না কদর্য্যতা এবং পশুত্বের ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিব? বিপ্লব তো ছড়াইয়া পড়িতেছে। যে বিপ্লব দেশ ও জাতির উত্থানের পূর্ব্বে সময় সময় দেখা দেয়, যার ভিতর উন্নতির বীজ নিহিত থাকে, ইহা কি সেই বিপ্লব? ভবিষ্যৎ বংশীয়দের উন্নতির জন্য ইহা যথাকালে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কি তাহারা কৃতজ্ঞতার সহিত এই বিপ্লবকে স্মরণ করিবে? না, আদি মানবের সেই পশুভাব আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে এবং ইহা দমন করিতে হইলে কঠোর নিয়ম পালন করা দরকার? এরূপে কি আমরা শান্তি নষ্ট ও জীবন বিপন্ন করিতেছি না?"

বুরো অনেক প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইয়াছেন, এই সব মত প্রচারের ফলে আজ পর্য্যন্ত সমাজের মহান অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। এ সব দুরাচার জীবন পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে।

———

তৃতীয় অধ্যায়

বিবাহিত জীবনে ভ্রষ্টাচার

আত্ম-সংযম দ্বারা বিবাহিত লোকে সন্তান-নিগ্রহ করে সে এক কথা, আর ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি করিয়া ইহার ফল এড়াইবার জন্য তাহারা যদি অন্য উপায় অবলম্বন করে, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। প্রথমোক্ত উপায়ে লোকে সব রকমে লাভবান হয়; দ্বিতীয়টির দ্বারা তাহাদের ক্ষতি ভিন্ন আর কিছুই হয় না। শ্রীযুক্ত বুরো মানচিত্র এবং অঙ্কের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, অবাধ ইন্দ্রিয়-সেবা করা এবং ইহার স্বাভাবিক ফল সন্তান-জন্ম বন্ধ করার উদ্দেশ্যে গর্ভনিরোধ-যন্ত্রের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবহারের ফলে শুধু পেরিসে নহে, সমগ্র ফরাসী দেশে মৃত্যু-হার অপেক্ষা জন্ম-হার কমিয়াছে। ফরাসী দেশ ৮৭টী ক্ষুদ্র জেলায় বিভক্ত, ইহার ৬৮টি জেলায় জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা বেশী। লট জেলায় জন্ম-হার ১০০ স্থলে মৃত্যুহার ১৬৮; টার্নগরী জেলায় জন্ম-সংখ্যা ১০০ স্থলে মৃত্যু-সংখ্যা ১৫৬। এমন কি যে উনিশটি জেলায় মৃত্যু-সংখ্যা অপেক্ষা জন্ম-সংখ্যা বেশী, সে সব যায়গায় অধিকাংশ স্থলের এই বৃদ্ধি ধর্ত্তব্য নহে। শুধু দশটি জেলায় এই বৃদ্ধি সুস্পষ্ট। মোরবিহান ও পাস-ডি-কালে জেলায় মৃত্যুহার সর্ব্বাপেক্ষা কম—১০০ জন্ম স্থলে মৃত্যুহার ৭৭। বুরো দেখাইয়াছেন এইরূপে আত্মহত্যা দ্বারা দেশকে জনশূন্য করা এখনও বন্ধ করা হয় নাই।

বুরো তার পর ফরাসী দেশের প্রত্যেক স্থানের অবস্থার খুঁটিনাটি

বিচার করিয়াছেন এবং নর্ম্যাণ্ডী সম্বন্ধে ১৯১৪ সালে লেখা এক বই হইতে নীচের অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—'গত ৫০ বৎসরে নর্ম্যাণ্ডীর লোক সংখ্যা তিন লক্ষ কমিয়াছে ; ইহার অর্থ এই সমগ্র ওর্ণ জেলায় যত লোক আছে, নরম্যাণ্ডীর তত লোক কমিয়াছে। ফরাসী দেশ পাঁচটি সুবায় বিভক্ত, এক সুবায় যত লোক আছে, প্রতি বিশ বৎসরে তত লোক কমিতেছে। মৃত্যুহার এইভাবে থাকিলে ফ্রান্সের উর্ব্বর শস্যশ্যামল ক্ষেত্র এক শত বৎসরে ফরাসীশূন্য হইবে। আমি ইচ্ছা করিয়া 'ফরাসীশূন্য' শব্দটি ব্যবহার করিলাম, কারণ নিশ্চয়ই অন্য দেশের লোক আসিয়া সেখানে বসতি করিবে ; ইহার অন্যথা হইলে বলিতে হইবে অবস্থা আরও শোচনীয়। কেনের চারি পাশে যে সব লোহার খনি আছে, সেখানে জার্মান শ্রমিকগণ কাজ করে ; এবং যেখান হইতে বিজয়ী উইলিয়ম * জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন, গত কল্য ঠিক সেখানে সর্ব্বপ্রথম একদল চীনা মজুর নামিয়াছে।' বুরো লিখিয়াছেন, অন্যান্য বহু প্রদেশের অবস্থা ইহা অপেক্ষা ভাল নহে।

তিনি পরে দেখাইয়াছেন জনসংখ্যা হ্রাসের ফলে ফরাসী জাতির সামরিক শক্তি কমিয়াছে। তাহার বিশ্বাস, একই কারণে ফ্রান্স হইতে কম লোকে বিদেশে বাস করিতে যাইতেছে এবং ফরাসী জাতির উপনিবেশ, ভাষা ও সভ্যতার বিস্তার না হইয়া অবনতি হইতেছে।

বুরো প্রশ্ন করিয়াছেন, 'প্রাচীনকালের সংযম অগ্রাহ্য করিয়া ফরাসী জাতি কি বেশী সুখ, পার্থিব সম্পদ, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং কৃষ্টির অধিকারী হইয়াছে ?' উত্তরে তিনি বলিতেছেন, 'স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে অল্প কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। সব রকম আপত্তির বিরুদ্ধে সুন্দর

* ইনি ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড জয় করেন—অনুবাদক

ভাবে উত্তর দিবার ইচ্ছা আমাদের যতই প্রবল হউক না কেন, যখন এ কথা বলা হয় যে, অবাধ ইন্দ্রিয়সেবা শরীরকে সুস্থ ও সবল করে, তখন তাহা বিশ্বাস করা যায় না। চারিদিক হইতে শুনা যাইতেছে যে যুবক ও বয়স্কদের তেজোবীর্য্য কমিয়া যাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সৈন্য বিভাগের কর্ত্তাদিগকে নূতন সৈন্য সংগ্রহের সময় শারীরিক যোগ্যতার সর্ত্ত কয়েকবার ঢিলা করিতে হইয়াছিল। জাতির সহনশীলতা সাংঘাতিকভাবে কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে যে, শুধু অসংযমই এই অধঃপতন আনিয়াছে, তবে ইহা সত্য যে অসংযম এজন্য অনেকখানি দায়ী, মদ্যপান ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করা প্রভৃতি কারণও ইহার জন্য আংশিকভাবে দায়ী। আমরা যদি স্থিরভাবে একটু চিন্তা করিয়া দেখি, তবে সহজে বুঝিব এই ভ্রষ্টাচার এবং যে মানসিক অবস্থা ইহাকে স্থায়ী করে তাহা অন্যান্য ব্যাধিরও বিশেষ সহায়ক। উপদংশাদি রোগের ভয়ানক বিস্তৃতি জনসাধারণের স্বাস্থ্যের মহা অনিষ্ট করিয়াছে।

ম্যালথাস-পন্থীগণ বলেন, যে-অনুপাতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা লোক সংখ্যা হ্রাস করা যায়, সেই অনুপাতে লোকের ধনসম্পদ্ বাড়ে। শ্রীযুক্ত বুরো এই কথা মানেন না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত জার্মানির অর্থ সম্পদ কিরূপে বাড়িতেছে এবং জনসংখ্যা হ্রাসের সহিত ফ্রান্সের অর্থ সম্পদ কিরূপে কমিতেছে তাহা তিনি অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রমিকদের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া অন্যান্য দেশে যেরূপে বাণিজ্য বিস্তার করা হয়, জার্মানির অসাধারণ বাণিজ্য বিস্তারের জন্য সেখানকার শ্রমিকদের স্বার্থ তাহা অপেক্ষা বেশী বিসর্জ্জন দেওয়া হয় নাই। তিনি রোসিনোলের এই লেখাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—'যখন জার্মানিতে শুধু ৪ কোটি ১০ লক্ষ লোক ছিল, তখন লোকে অনাহারে মরিত;

যখন তাহাদের সংখ্যা ৬ কোটী ৮০ লক্ষ হইয়াছে, তখন হইতে জার্মানি দিন দিন অর্থশালী হইতেছে।' বুরো বলেন, সন্ন্যাসী বা সংযমী না হইয়াও এই সব লোক বৎসর বৎসর সেভিংস্-ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা জমাইয়াছে। ১৯১১ সালে এই সঞ্চিত টাকার পরিমাণ ছিল ২২০০ কোটি ফ্রাঙ্ক্; ১৮৯৫ সালে ছিল মাত্র ৮০০ কোটি ফ্রাঙ্ক; প্রতি বৎসর তাহারা ৮৫ কোটি ফ্রাঙ্ক জমাইয়াছে।

জার্মানির যন্ত্র-পাতির উন্নতির কথা বর্ণনা করিয়া, সেখানকার সাধারণ বিদ্যাচর্চ্চা বিষয়ে শ্রীযুক্ত বুরো লিখিয়াছেন:—সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানলাভ না করিয়াও সকলে ইহা বুঝিতে পারেন যে, উন্নত শ্রমিক, উচ্চশিক্ষিত পরিদর্শক এবং সুশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া না গেলে, সেখানে এরূপ উন্নতি অসম্ভব হইত। শিল্প বিদ্যালয়গুলি তিন রকমের—পাঁচ শতের বেশী বিদ্যালয়ে পেশাগত শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়—শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭০ হাজার; যন্ত্রবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও অনেক বেশী, ইহার কোনো কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা হাজারের উপর; সর্ব্বশেষে আছে আরও উন্নত শিক্ষাদানের জন্য কলেজ-সমূহ, সেখানকার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫০০০, এই সব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ডক্টর উপাধি বিতরণ করিয়া থাকে। * * * ৩৬৫টি বাণিজ্য বিদ্যালয়ে ৩১,০০০ ছাত্র আছে এবং অসংখ্য বিদ্যালয়ে ৯০,০০০ ছাত্র কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করে। অর্থ উপার্জ্জনের বিভিন্ন বিভাগের এই ৪০০,০০০ ছাত্রের তুলনায় ফরাসী দেশের পেশাগত শিল্প শিক্ষার্থী ৩৫ হাজার ছাত্রের সংখ্যা কত কম? ফরাসী দেশে ১৭, ৭০,০০০ লোক কৃষিজীবি, ইহাদের ভিতর ৭,৭৯,৭৯৮ জনের বয়স আঠার বৎসরের কম, এ অবস্থায় বিশেষ কৃষি-বিদ্যালয়ে মাত্র ৩,২৫৫ জন ছাত্র আছে। বুরো ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, জার্মানির লোকের জন্মসংখ্যা মৃত্যুসংখ্যা

অপেক্ষা বেশী বলিয়াই যে তাহাদের এ সব আশ্চর্য্যজনক উন্নতি হইয়াছে তাহা নহে। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, অন্যান্য সুযোগ থাকিলে জন্মহার অনেক বেশী হওয়া রাষ্ট্রীয় উন্নতির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। বাস্তবিক তিনি যাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন তাহা এই, জন্মসংখ্যার বৃদ্ধি পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি ও নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী নহে। জন্ম-সংখ্যা হিসাবে ভারতবাসী আমাদের অবস্থা ফরাসীদের মত নহে। কিন্তু একথা বলা চলে যে, ভারতের জন্মসংখ্যার অতি বৃদ্ধি, জার্মানির মত আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতির সহায়ক নহে। কিন্তু বুরোর অঙ্ক এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতের অবস্থার বিচার অন্য এক অধ্যায়ে করিব।

যেখানে মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা জন্মসংখ্যা বেশী, সেই জার্মানির অবস্থা বর্ণনা করিয়া বুরো বলেন, "সকলেই জানেন ধন-সম্পদে ফরাসী জাতির স্থান ইউরোপে চতুর্থ এবং সে তৃতীয় রাষ্ট্রের অনেক নীচে। টাকা খাটাইয়া ফ্রান্স বৎসরে পায় ২৫০০ কোটি ফ্রাঙ্ক, জার্মানি পায় ৫০০০ কোটি ফ্রাঙ্ক। ১৮৭৯ হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসরে ফরাসী দেশের জমির মূল্য ৯,২০০ কোটি হইতে ৫,২০০ কোটি ফ্রাঙ্কে নামিয়াছে অর্থাৎ ৪,০০০ কোটি ফ্রাঙ্ক কমিয়াছে। দেশের প্রত্যেক জেলায় ক্ষেতে কাজ করা কৃষাণের অভাব হইয়াছে এবং এমন অনেক জেলাও আছে যেখানে বৃদ্ধ ভিন্ন কদাচিত অন্য কাহাকেও দেখা যায়।" তিনি লিখিয়াছেন, "ভ্রষ্টাচার এবং সন্তান নিরোধের ফলে সমাজের সকল রকম শক্তি ক্ষীণ হয় এবং সামাজিক জীবনে বৃদ্ধদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপিত হয়। প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ফ্রান্সে শিশুর সংখ্যা ১৭০, ইংলণ্ডে ২১০ ও জার্মানিতে ২২০। বৃদ্ধের সংখ্যার অনুপাত স্বভাবত যাহা হওয়া উচিত ফ্রান্সে তাহা অপেক্ষা বেশী। যাহারা বৃদ্ধ নহে তাহারাও ভ্রষ্টাচারের

ফলে অকালবৃদ্ধ হইয়াছে—তাহাদের ভিতর শক্তিহীন জাতির সব রকম দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা দেখা দিয়াছে।”

গ্রন্থকার তারপর বলিতেছেন—‘পারিবারিক জীবনে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন’ নীতির কল্যাণে ফরাসী জাতির অধিকাংশ লোকে তাহাদের শাসকদের এই শিথিল পারিবারিক নীতির প্রতি উদাসীন। তিনি দুঃখের সহিত লিওপোল্ড মোনোর নীচের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

“অত্যাচারীকে গালি দেওয়া এবং যাহারা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাহাদিগকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধে যোগ দেওয়া বেশ। কিন্তু যাহারা বিবেককে প্রলোভন হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করে না, অন্যের আদর অথবা উষ্মার ইঙ্গিত দ্বারা যাহাদের সাহস কম-বৃদ্ধি হয়, যাহারা লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া প্রথম যৌবনে স্ত্রীর নিকট পবিত্র মুহূর্ত্তে সানন্দে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অম্লানচিত্তে ভঙ্গ করে এবং এই কাজের জন্য গৌরব বোধ করে, যাহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরিবারের সকলকে অত্যাচারপিষ্ট করে, তাহারা কিরূপে মুক্তিদাতা হইতে পারে?”

লেখক পরে বলিতেছেন—“এইরূপে যেদিকে তাকাই না কেন দেখিতে পাইব যে, আমাদের নৈতিক অসংযম ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মহা অনিষ্ট করিতেছে এবং আমাদের দুঃখ অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছে। যুবকদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বেশ্যাবৃত্তি, অশ্লীল পুস্তক ও চিত্রাদির প্রচার, অর্থ লোভে বিবাহ, মিথ্যা অভিমান, বিলাসিতা, ব্যভিচার ও বিবাহবিচ্ছেদ, কৃত্রিম বন্ধ্যাত্ব ও গর্ভপাত জাতিকে দুর্ব্বল এবং লোকসংখ্যা হ্রাস করিয়াছে। মানুষ আপনার শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিতেছে না এবং জন্মসংখ্যা হ্রাসের সহিত শিশুরা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতেছে। ‘জন্ম-সংখ্যা কম হইলে, সন্তান

ভাল হইবে,' কোনো কারণে এই কথা তাহাদের ভাল লাগিয়াছে। ইহারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের স্থূল বিচার করিয়া ভাবিয়াছিল, ঘোড়া ও ভেড়ার ন্যায় মানুষ একই ভাবে সন্তান উৎপাদন করিবে। অগস্ত কোঁত তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, যাহারা এই সব সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন, তাহারা পশু-চিকিৎসক হইলে জগতের মঙ্গল হইত, কারণ ব্যক্তি ও সমাজের জটিল মনোবৃত্তি বুঝিবার মত কোনো শক্তি তাহাদের নাই।

ব্যাপার এই, বিষয়ভোগের সহিত সংশ্লিষ্ট মনোবৃত্তি ও সিদ্ধান্ত লোকের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যতটা প্রভাব বিস্তার করে, মানুষের অপর কোনো মনোবৃত্তি, সিদ্ধান্ত ও অভ্যাস তাহা করে না। সে ইহাকে বাধা দিক এবং আয়ত্তে রাখুক, অথবা পরাজিত হইয়া ইহার প্রবাহে ভাসিয়া চলুক, তাহার কাজের প্রতিধ্বনি সামাজিক জীবনের বহুদূরবর্ত্তী স্থানেও পৌঁছিবে; কারণ প্রকৃতির নিয়ম এই যে, অত্যন্ত গুপ্ত কাজও আপনার প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারে না।

"যখন আমরা কোনোপ্রকার নৈতিক বন্ধন ছিন্ন করি, তখন আমরা ভাবি, আমাদের দুষ্কার্য্যের পরিণাম খারাপ হইবে না। প্রথমতঃ, নিজেদের সম্বন্ধে আমরা সন্তুষ্ট থাকি, কারণ আমাদের নিজেদের সুখ অথবা স্বার্থসাধনই আমাদিগকে এ কাজে নিয়োজিত করে; সমাজের সম্বন্ধে আমরা ভাবি, সমাজ এত উচ্চ যে ইহা আমাদের মত সামান্য লোকদের কুকার্য্য লক্ষ্য করিবে না; সর্ব্বোপরি আমরা মনে মনে আশা করি যে, অপর সকলে পবিত্র ও সদাচারী থাকিবে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় কুফল এই যে, যতদিন এই দোষ অল্প লোকের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে ততদিন উপরোক্ত কাপুরুষোচিত হিসাব প্রায়ই ঠিক হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার ফলে মানুষের এই মনোভাব ক্রমে বদ্ধমূল

হইতে থাকে এবং পরিশেষে ইহা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়—এবং ইহাই আমাদের চরম শাস্তি।”

“কিন্তু এমন দিন আসে যখন এই ভাবে চলার ফলে অন্যান্য কর্ত্তব্য-চ্যুতি ঘটে; আমাদের প্রত্যেক দুষ্কার্য্যের ফলে, অন্য লোকের পক্ষে যে ধর্ম্মপথে চলা আমরা সহজ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, তাহা আরও দুর্গম ও কঠোর হইয়া উঠে এবং আমাদের প্রতিবাসীরা ধোকা খাইতে খাইতে হয়রাণ হইয়া ব্যস্ততার সহিত আমাদের অনুকরণ করে। ঐ দিন হইতে পতন আরম্ভ হয় এবং প্রত্যেকে আপন আপন দুষ্কার্য্যের ফল এবং তাহার দায়িত্বের পরিমাণ বুঝিতে পারে।

“যেখানে বদ্ধ থাকিবে মনে করিয়াছিলাম, সেই গুপ্তস্থান হইতে গোপন কাজ বাহির হইয়া পড়ে। বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া যে ভাবে রেডিও চলে, ইহার সেইরূপ অপার্থিব শক্তি আছে; সেই শক্তির বলে ইহা সমাজের সব স্তরে প্রবেশ করে; প্রত্যেকের দোষে প্রত্যেকে দুঃখভোগ করে; কারণ ক্ষুদ্র জলাশয়ে পাথর ফেলিলে, তাহা হইতে ছোট ছোট তরঙ্গ যেরূপে বহুদূরে যায়, তেমনি আমাদের কাজের প্রভাব, সমাজের অতি দূরতম প্রদেশেও অনুভূত হয়।

“ভ্রষ্টাচার জাতির প্রাণশক্তিকে দ্রুত শুকাইয়া ফেলে, পরিণত বয়স্কদের শরীর ক্ষীণ ও রোগপ্রবণ করিয়া তোলে এবং তাহাদের শরীর ও মনের বল কমাইয়া দেয়।

চতুর্থ অধ্যায়

সংযমের উপকারিতা

ভ্রষ্টাচার তথা কৃত্রিম উপায়ে দুর্নীতির প্রসার ও তার ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, লেখক তাহা নিবারণ করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যে অংশে আইন-কানুন, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ও সম্পূর্ণ ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা আছে, আমি তার কথা এখানে কিছু বলিব না। তার পর তিনি লোকমত গঠন করিয়া অবিবাহিতদের সংযম রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, যাহারা সব সময় পাশবৃত্তি দমন করিতে সক্ষম নহে, তাহাদের বিবাহের প্রয়োজনীয়তা, বিবাহের পর স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। সংযমের বিরুদ্ধে কেহ কেহ এই যুক্তি পেশ করেন যে, ইহা নরনারীর স্বাভাবিক বৃত্তির বিরোধী, স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর, ইহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে, প্রত্যেককে ইচ্ছামত জীবনযাপন করার ও সুখী হইবার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করে। তিনি এ সব যুক্তি আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি স্বীকার করেন না যে, অন্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জননেন্দ্রিয় আপনার ভোগ চায়। ইহা সত্য হইলে ইহাকে দমনে রাখিবার যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ইচ্ছাশক্তির আছে, তার মূল কিরূপে নির্ণীত হইবে? আধুনিক সভ্যতা অকালে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের সামনে অসংখ্য উত্তেজনার কারণ উপস্থিত করে বলিয়া, অসময়ে তাহাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা জাগ্রত

হয়। আবার এই ইন্দ্রিয়সেবাকে কোনো কোনো কূট তার্কিক অতি প্রয়োজনীয় মনে করেন।

টুবিগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অষ্টার্লেন বলেন, "কামবাসনা এত প্রবল নহে যে, বিবেক অথবা নৈতিক শক্তির সাহায্যে ইহাকে সংযত করা যায় না। উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত যুবক যুবতীর নিজেকে সামলাইয়া চলা উচিত। তাহাদের জানা উচিত, এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত আত্মত্যাগের পুরষ্কারস্বরূপ হৃষ্টপুষ্ট শরীর, অটুট স্বাস্থ্য ও নিত্য নূতন উৎসাহের অধিকারী হওয়া যায়।"

"সংযম ও পূর্ণ পবিত্রতার সহিত শরীরবিজ্ঞান ও নীতিধর্ম্মের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। নীতি ও ধর্ম্মের অনুশাসনের ন্যায় শরীরবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবার সমর্থন করে না।"

লণ্ডনের রয়াল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্যার লায়নস্ বিলী বলেন, "শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ লোকের দৃষ্টান্ত হইতে সব সময় বুঝা যায় যে, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিকার ও সহজাত সংস্কারকেও প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে এবং জীবন যাপন প্রণালী ও পেশা নির্ব্বাচনে সাবধানতা অবলম্বন করিলে সংযত করা যায়। শুধু বাহ্যিকভাবে নহে, যাহারা দেহমনে ইন্দ্রিয়সেবা হইতে বিরত হইয়াছেন, তাহাদের কোনো অনিষ্ট হইতে পারে না। এক কথায়, মন ভাল হইলে অবিবাহিত থাকা একটুও দুঃসাধ্য নহে। * * * সম্ভোগ-বিরতিই ব্রহ্মচর্য্য নহে। মানসিক পবিত্রতা এবং অটল বিশ্বাসের ফলে যে শক্তিলাভ হয় তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।

সুইস মনোবিজ্ঞানবিৎ ফোরেল বলেন, "প্রত্যেক রকম স্নায়বিক কাজ অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি পায় ও শক্তিশালী হয়। অন্যপক্ষে, কোনো বিশেষ স্নায়ুর কাজ বন্ধ রাখিলে, উত্তেজনার কারণ কমিয়া তাহা সংযত থাকে।

ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের সব কারণই বিষয়-বাসনাকে অত্যন্ত প্রবল করে। এই সব উত্তেজনা এড়াইতে পারিলে, বিষয়-তৃষ্ণা ক্রমে কমিয়া যায়। যুবক-যুবতীদের এই ধারণা আছে যে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। তথাপি অনেকে সংযত জীবন যাপন করিয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন যে, সংযম রক্ষা করিলে স্বাস্থ্যের কোনো অনিষ্ট হয় না।

আর এক বিদ্বান ব্যক্তি বলেন, "যাহারা পূর্ণ সংযম পালন করিয়াছেন, অথবা বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা পালন করিয়াছেন, এরূপ কতকগুলি লোককে আমি জানি—ইহাদের বয়স ২৫।৩০ অথবা তাহা অপেক্ষা বেশী। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, তবে তাহারা নিজেদের কথা ঢাক-ঢোল পিটাইয়া প্রকাশ করেন না।"

"যাহাদের শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ এরূপ ছাত্রদের নিকট হইতে আমি অনেক গোপন চিঠি পাইয়াছি। ইন্দ্রিয়সংযম সুসাধ্য সে কথা আমি বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করি নাই বলিয়া তাহারা অভিযোগ করিয়াছেন।

ডাক্তার একটন বলেন, 'বিবাহের পূর্ব্বে যুবকদের পূর্ণ সংযম পালন করা সম্ভব এবং কর্ত্তব্য।' সার জেম্‌স্ প্যাজেট বলেন, 'পবিত্রতা আত্মার যেমন কোনো অনিষ্ট করে না, তেমনি শরীরেরও কোনো অনিষ্ট করে না। সংযমের পথে চলা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।'

ডাক্তার পেরিয়র বলেন, 'পূর্ণ সংযম পালন করিলে অনিষ্ট হয়, এই ধারণা অনেকের আছে। এই ভুল ধারণা নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করা দরকার। কারণ ইহাতে যে শুধু বালক-বালিকাদের মন বিগড়াইয়া দেয় তাহা নহে, উহাদের পিতামাতার মনও বিগড়াইয়া দেয়। ব্রহ্মচর্য্য যুবকদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির সহায়তাকারী।'

সার এণ্ড ক্লার্ক বলেন, "সংযম কোনো ক্ষতি করে না, শরীরগঠন ও

পুষ্টির বাধা দেয় না ; ইহা শক্তি বৃদ্ধি করে এবং বুদ্ধিকে প্রখর করে। ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা আত্ম-সংযমের শক্তি হ্রাস করে, অলসতা বৃদ্ধি করে, শরীরকে অকর্ম্মণ্য ও ঘৃণ্য করে এবং ইহাকে এমন সব রোগের আকর করে, যেগুলি পরবর্ত্তী অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়। যুবকদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইন্দ্রিয়সেবা দরকার, এ কথা শুধু ভুল নহে, ইহা মিথ্যা ও অনিষ্টকর এবং ভয়ানক নিষ্ঠুরতাপূর্ণ।"

ডাক্তার সারব্লেড লিখিয়াছেন, "অসংযমের ফল যে খারাপ তাহা অবিসংবাদিত এবং সর্ব্বজনবিদিত, পরন্তু সংযমের ফল যে খারাপ তাহা কল্পিত মাত্র। অনেক প্রসিদ্ধ বিদ্বান লোকে প্রথমটি সমর্থন করেন, কিন্তু কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি শেষোক্ত মত সমর্থন করেন না। শেষের দলের লোকে প্রকাশ্যভাবে তাহাদের মত আলোচনা পর্য্যন্ত করিতে চান না।

ডাক্তার মোণ্টেগাজ্জা তাঁহার এক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "সংযমের ফলে কাহারও কোনো ব্যাধি হইতে দেখি নাই। সব লোকে বিশেষতঃ যুবকেরা সংযমের টাটকা ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

বিখ্যাত অধ্যাপক ডুবয় বলেন, "যাহারা অধিক ইন্দ্রিয়সেবা করে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা কিছু সংযত জীবন যাপন করে, তাহাদের মধ্যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য কম।" ডাক্তার ফিয়ার বলেন, "যাহারা মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে, ভোগ-বিরতি তাহাদের কোনো অনিষ্ট করে না এবং ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করার উপর স্বাস্থ্যরক্ষা নির্ভর করে না।"

অধ্যাপক আলফ্রেড ফোর্ণিয়ার লিখিয়াছেন, "সংযম রক্ষা করিলে যুবকদের অনিষ্ট হয়, এরূপ অযোগ্য ও তরল আলোচনা কোথাও কোথাও হইয়া থাকে জানি। আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, ইহাতে কোনো অনিষ্ট হয় না। চিকিৎসক হিসাবে আমার এইরূপ

ব্যাপার লক্ষ করার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বে, ইহাতে যে কাহারও কোনো অনিষ্ট হইয়াছে, তার কোনো প্রমাণ আমি পাই নাই।"

"ইহা ভিন্ন শরীর-শাস্ত্রবেত্তারূপে আমি বলিব, ২১ বৎসর বা এইরূপ বয়সের পূর্ব্বে প্রকৃত বীর্য্য-পুষ্টি হয় না; এবং বিশেষভাবে কুৎসিৎ উত্তেজনা দ্বারা কু-বাসনা উদ্দীপ্ত না হইলে, তার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়সেবার ইচ্ছা উৎপন্ন হয় না। অকালে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির ইচ্ছার মূলে থাকে কৃত্রিম অভাব, এবং অধিকাংশ সময় ইহা কুশিক্ষার ফল।"

"সে যাহা হউক নিশ্চিত জানিয়া রাখুন, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পথে চলা অপেক্ষা তাহা সংযত করিতে গেলে শরীরের অনিষ্টের সম্ভাবনা কম হইবে।"

এই সব সুবিখ্যাত লোকের মত উদ্ধৃত করার পর, শ্রীযুক্ত বুরো ১৯০২ সালে ব্রুসেল্‌স্ নগরে, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ও নীতিরক্ষা কংগ্রেসের অধিবেশনে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ১০২ জন বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন:—"যুবকদিগকে সর্ব্বোপরি এই শিক্ষা দিতে হইবে যে, ব্রহ্মচর্য্য এমন জিনিষ যাহা কাহারও কোনো অনিষ্ট তো করেই না, বরং ইহা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরম আবশ্যকীয়।

বুরো তারপর লিখিতেছেন:—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোনো খৃষ্টান বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিভাগের আচার্য্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "পবিত্র জীবন যাপন করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়, এইরূপ উক্তির মূলে কোনো ভিত্তি নাই। পবিত্র নৈতিক জীবন যাপন করিয়া, কাহারও কোনো ক্ষতি হইয়াছে এরূপ কিছু আমাদের জানা নাই।"

"এ কথা শুনা গিয়াছে এবং নীতিবিদ ও সমাজ-শাস্ত্র-ধুরন্ধরগণ শ্রীযুক্ত রায়সেনের এই স্পষ্ট সত্যের পুনরাবৃত্তি করেন যে, আহার ও ব্যায়ামের

স্থায় বিষয়-ভোগের তৃপ্তির দরকার নাই। এ কথা সত্য, দুই একটি বিশেষ উদাহরণ ব্যতীত, প্রত্যেক নরনারী কোনো অসুবিধায় না পড়িয়া, কোনো প্রকার পীড়াগ্রস্ত না হইয়াই, পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে। বহুবার বলা সত্ত্বে ইহার পুনরুক্তি করিলে দোষের হইবে না যে, সংযম হেতু জনসাধারণের কোনো ব্যধি উৎপন্ন হয় নাই, এবং জনসাধারণই সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশী। ইহাও সত্য যে অনেক সর্ব্বজনবিদিত সংঘাতিক মারাত্মক ব্যাধি অসংযম হইতে উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও অভ্রান্তভাবে খাদ্য হইতে উৎপন্ন প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তির উচিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে—ইহাকে আমরা মাসিক ঋতু অথবা অনায়াস-স্খলিত বীর্য্যরূপে দেখি।

"সুতরাং ডাক্তার ভিরি ঠিকই বলিয়াছেন যে, বাস্তবিক আবশ্যকতা অথবা খাঁটি সহজাত সংস্কারের সহিত এই প্রশ্নের কোনো সম্বন্ধ নাই। সকলেই জানেন, ক্ষুধায় আহার না করিলে, অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বন্ধ করিলে, পরিণাম কিরূপ খারাপ হইতে পারে; কিন্তু সাময়িক অথবা স্থায়ী সংযমের ফলে কোনো সামান্য অথবা সাংঘাতিক ব্যারাম হইয়াছে, এ কথা কেহই লিখেন নাই। আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি, যাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাহারা চরিত্র-বলে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন, কম উৎসাহী অথবা কম বলবান নহেন, এবং বিবাহ করিলে সন্তানের জন্ম দিতে কম যোগ্য নহেন। যে প্রয়োজন অবস্থা অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়, যে সহজাত সংস্কার তৃপ্তির অভাবে শান্তভাব ধারণ করে, তাহা প্রয়োজনও নহে সহজাত সংস্কারও নহে।

যে বালক বাড়িতেছে শারীরিক প্রয়োজনে ইন্দ্রিয়সেবা করা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক; বরং তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও দৈহিক গঠনের

উন্নতির জন্য পূর্ণ সংযমই বিশেষ দরকার। যাহারা ইহা মানে না, তাহারা স্বাস্থ্যের মহা অনিষ্ট করে। যৌবনপ্রাপ্তির সময় অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, শরীর ও মনের বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং সাধারণ উন্নতি হয়। বর্দ্ধিষ্ণু বালকের পক্ষে তাহার সমগ্র জীবনী-শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন খুব বেশী, কারণ এই সময় রোগ-প্রতিরোধ করার শক্তি প্রায়ই কমিয়া যায়, ব্যাধি এবং মৃত্যুহার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হয়। দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ শরীরবৃদ্ধি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশ, সমগ্র শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন, যার পরিণামে বালক মানবত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রকৃতির পক্ষে বহু পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। এই সময় সব রকম মাত্রাধিক্য বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়-সেবা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সংযম

ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলে যে শারীরিক উপকার হয় তাহা আলোচনার পর, বুরো ইহার নৈতিক ও মানসিক উপকার সম্বন্ধে অধ্যাপক মণ্টেগাজার নীচের লেখাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"সকল মানুষ বিশেষতঃ যুবকগণ ব্রহ্মচর্য্যের ফল টাটকা পাইতে পারেন। ইহার ফলে স্মরণশক্তি স্থির ও প্রখর, বুদ্ধি উর্ব্বর, ইচ্ছাশক্তি অদম্য হয় এবং সমস্ত জীবনে এমন এক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, যার কল্পনাও স্বেচ্ছাচারীগণ কখনও করিতে পারে না। সংযম আমাদের পারিপার্শ্বিক জিনিষকে এমন স্বর্গীয় আভায় রঞ্জিত করে যাহা আর কিছুতেই পারে না; ইহা বিশ্বের অতি সামান্য দ্রব্যকেও উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করে এবং আমাদিগকে চিরস্থায়ী সুখের পবিত্রতম আনন্দের ভিতর লইয়া যায়—এ আনন্দ কখনও হ্রাস বা ম্লান হয় না। গ্রন্থকার আরও বলেন, "ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী তেজস্বী যুবকদের প্রফুল্লচিত্ততা ও আনন্দ এবং ইন্দ্রিয়ের দাসগণের অশান্তি ও অস্থিরচিত্ততার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।" তিনি তার পর কামুকতা ও চরিত্রহীনতার শোচনীয় পরিণামের সহিত সংযমের উপকারিতার তুলনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলেন, "সংযমের ফলে কাহারও কোনো রোগ হয় না, কিন্তু অসংযমের ফলে যে ভয়ানক ব্যাধি হয় সে কথা কে না জানে? অসংযমের ফলে শরীর পচিয়া যায়, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধি এবং অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত কলুষিত হয়।

ইহার ফলে সর্ব্বত্র চরিত্রের অবনতি, ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম প্রবৃত্তি এবং স্বার্থপরতা বৃদ্ধি হয়।"

এ পর্য্যন্ত বিবাহের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়সেবার তথাকথিত প্রয়োজন এবং তার ফলে যুবক-যুবতীর যথেচ্ছ-বিহারের বা স্বাধীনভাবে চলার কথা বলা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বে, যাহারা বীর্য্যনাশ করা আবশ্যক মনে করেন, তাহারা বলেন, ইহাতে বাধা দিয়া তোমরা আমাদের স্বাধীনভাবে শরীর-ব্যবহারের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছ। গ্রন্থকার সুন্দর যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় এরূপে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন আছে।

গ্রন্থকার বলেন, "সমাজতত্ত্ববিদের মতে কর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের নাম জীবন। এমন কোনো কাজ নাই, যাহাকে আমরা অন্যান্য কাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি। প্রত্যেক কাজের প্রভাব সর্ব্বত্র পড়িবে। আমাদের অতি গোপন কাজ, চিন্তা, অথবা সংকল্পের প্রভাব এত দূরে ও গভীরভাবে পড়ে, যার ধারণা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। মানুষ মানুষ বলিয়াই সামাজিক জীব। এই সামাজিক প্রবৃত্তি তাহার মনুষ্যত্বেরই অঙ্গ। ইহা সে বাহির হইতে লাভ করে নাই। মানুষের সব কাজের ভিতরকার এই অখণ্ড সম্বন্ধ বিচার না করিয়া, কখনও কখনও কোনো কোনো সমাজ দুই এক বিষয়ে লোককে স্বাধীন বানাইতে চাহে। এই স্বাধীনতাকে স্বীকার করার ফলে ব্যক্তি আপনাকে ছোট করিয়া ফেলে—আপনার মহত্ত্ব খোয়াইয়া বসে।"

গ্রন্থকার আরও বলেন, "অবস্থাবিশেষে রাস্তায় থুতু ফেলার অধিকার যখন আমাদের নাই, তখন বীর্য্যরূপ মহাশক্তি খরচ করার স্বাধীনতা আমাদের কিরূপে থাকিবে? এ কাজ কি এরূপ যে, উপরে

বর্ণিত সমস্ত কাজের পারস্পরিক অখণ্ড সম্বন্ধের সহিত ইহার কোনো সংস্রব নাই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, গুরুত্ব হেতু ইহার প্রভাব আরও গভীর। যে নব-যুবক এবং বালিকা নিজেদের মধ্যে এখনই এরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের কথা ধরুন। তাহারা মনে করে, এ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন—তাহাদের কাজের জন্য আর কাহারও কিছু আসিয়া যায় না; ইহার ফল শুধু তাহারা দুজনে ভোগ করিবে। স্বাধীনতার ভুল ধারণার বশে তাহারা ভাবে, তাহাদের গোপন কাজের সহিত সমাজের কোনো সম্বন্ধ নাই এবং তাহাদের কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাজ-শাসনের বাহিরে। ইহা শিশুর কল্পনা! তাহারা জানে না যে, প্রত্যেকের গুহ্য এবং ব্যক্তিগত কাজের ভয়ানক প্রভাব অত্যন্ত দূরের কাজের উপরও পড়ে। এইরূপে সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। যদি তুমি শুধু আনন্দের জন্য অল্পস্থায়ী অথবা অনুৎপাদক যৌনমিলনের অধিকার স্থাপন করিতে অগ্রসর হও, যদি জীবনের সারপদার্থ বীর্য্যকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে যাও, তবে তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, ইহা দ্বারা সমাজের ভিতর ভেদ ও বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করিবে। আমাদের স্বার্থপরতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা সম্পর্ণরূপে বিগড়াইয়া গেলেও সমাজ ইহা ধরিয়া লয় যে, লোকে জননবৃত্তি তৃপ্তির সহিত ইহার দায়িত্ব ভালভাবে গ্রহণ করিবে। এই দায়িত্ব লোকে ভুলিয় যায় বলিয়া, সমাজে আজ মূলধন এবং শ্রম, মজুরী ও সম্পত্তির অধিকার, করধার্য্য করা এবং সৈন্যদলভুক্ত হওয়া, প্রতিনিধিত্বের অধিকার এবং নাগরিকের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় লইয়া জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। কেহ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, সে একই আঘাতে সমাজের সমস্ত সংগঠন নষ্ট করিয়া দেয়। এরূপে সে সমাজ-বন্ধনের মূলতত্ত্ব অগ্রাহ্য করে, অপরের বোঝা ভারি

করিয়া নিজে হালকা হইতে চায় এবং পরগাছার ন্যায় জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করে; সুতরাং সে লুণ্ঠনকারী, চোর, জুয়াচোর অপেক্ষা ভাল নহে। অন্যান্য শক্তির ন্যায় শারীরিক শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য আমরা সমাজের নিকট দায়ী। সমাজ এ বিষয়ে নিরস্ত্র। সমাজের মঙ্গলের জন্য ঐ শক্তি হিসাব করিয়া ব্যবহার করার দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, সেজন্য এ দায়িত্ব অন্যান্য দায়িত্ব অপেক্ষা গুরুতর।"

"স্বাধীনতা বাহির হইতে সুখের মনে হয়, পরন্তু ইহা বাস্তবিক এক বোঝা স্বরূপ। ইহার ধারণা প্রথমেই হইতে পারে। মন ও বিবেকের ভিতর ঐক্য আছে তা জানি; এ দুটির ভিতরই আমাদের শক্তি নিহিত আছে; পরন্তু উভয়ের ভিতর বিস্তর পার্থক্যও দেখা যায়। যখন মন ও বিবেক বিপরীত পথে চলিতে বলে, তখন কাহাকে মানিব? আমাদের বিবেক বুদ্ধি হইতে যাহা উৎপন্ন তাহাকে মানিব, না অত্যন্ত হীন ইন্দ্রিয়লালসা হইতে যাহা উৎপন্ন তাহাকে মানিব? যদি বিবেকের জয় হইলে সমাজের উন্নতি হয়, তবে এই দুটির ভিতর একটি রাস্তা বাছিয়া লওয়া কিছু শক্ত নহে। তবে তর্কের খাতিরে এ কথাও বলা চলে যে, শরীর ও আত্মার যুগপৎ বিকাশ চাই। সে বেশ কথা! কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আত্মার সামান্য বিকাশের জন্যও কিছু না কিছু সংযম পালন করিতে হয়। প্রথমে এই বিলাসের ভাবকে নষ্ট করিয়া দিলে, পরে যাহা ইচ্ছা হওয়া যায়।"

গ্যাব্রিয়েল সিলেস লিখিয়াছেন, "আমরা মানুষ হইতে ইচ্ছা করি এ কথা বলা খুব সোজা, কিন্তু ইহা এক কঠোর কর্তব্য এবং ইহা পালনে সকলেই অল্প বিস্তর অক্ষম। 'আমরা স্বাধীন হইতে চাই' ইহা ঘোষণা করিয়া লোকের অন্তরে আমরা ত্রাসের সঞ্চার করি। সহজাত সংস্কারের গোলামরূপে ইচ্ছামত কাজ করাকে যদি

স্বাধীনতা বলিতে হয়, তবে এ জন্য গর্ব্ব করার কিছু নাই। যদি খাঁটি স্বাধীনতা চাই, তবে যেন কোমর বাঁধিয়া স্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই। একতা, সাম্য এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছু বুলি কপচাইয়া গর্ব্বভরে আমরা ভাবি যে, আমরা ভগবানের অমর সন্তান। কিন্তু এই 'আমি'কে ধরিতে চেষ্টা করিলে, 'আমি'র খোঁজ পাই না; ইহা অসংখ্য স্বতন্ত্র প্রাণীতে পরিণত হইবে—ইহারা একে অপরকে অস্বীকার করে, ইহাদের ইচ্ছাও পরস্পরবিরোধী—এই সব ইচ্ছার সমষ্টি লইয়াই আমি। যে সব কুসংস্কার এবং প্রলোভনের অধীন আমি হইয়া থাকি, আমি তাহাই। আমার এই স্বাধীনতা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে—এই দাসত্বকে অবশ্য আমি দাসত্ব মনে করি না এবং বাধা দেই না।"

রায়সেন বলেন, "সংযম শান্তির এবং অসংযম অশান্তিরূপ মহাশক্রর উৎস। কামেচ্ছা সব সময় বিপদসঙ্কুল। কিন্তু যৌবনে ইহা ভয়ানক অধঃপতনের কারণ হইতে পারে। ইহা আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে বিলকুল বিগড়াইয়া দিতে পারে। যে যুবক প্রথমবার কোনো স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হয়, সে জানে না যে, এরূপে সে তাহার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক জীবন লইয়া খেলা করিতেছে; সে ইহাও জানে না যে, এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কথা ভবিষ্যতে তাহার স্মৃতিপটে উদিত হইয়া তাহাকে বার বার যাতনা দিবে এবং সে আপনার ইন্দ্রিয়ের হীন দাসরূপে পরিণত হইবে। এমন অনেক লোকের কথা জানি, যাহাদের নিকট লোকে অনেক কিছু আশা করিয়াছিল, কিন্তু যাহারা গোল্লায় গিয়াছে—প্রথম বারের নৈতিক পতন হইতেই তাহাদের অধঃপতন সুরু হইয়াছে।"

কবিও দার্শনিকের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন, "মানুষের

আত্মা গভীর পাত্রের ন্যায়, একবার যদি ইহার উপর কলুষিত জল ফেলা হয়, তবে সহস্রবার ধুইলেও ইহার কলুষ দূর হয় না।"

ইংলণ্ডের বিখ্যাত শরীর-শাস্ত্র-বিদ কেণ্ড্রিক সাহেব বলেন :— যৌবনোন্মেষের সময় অবৈধ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কেবলমাত্র নৈতিক অপরাধ নহে, ইহা শরীরের পক্ষে মহা অনিষ্টকর। একবার বশ্যতা স্বীকার করিলে, এই নূতন অভাব আরও অত্যাচার করিবে, এবং মন অপরাধী হইলে ইহার কথা শুনিতে ইচ্ছা হইবে এবং ইহার শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে। প্রত্যেক বারের নূতন কাজ, গোলামীর জিঞ্জিরে এক নূতন কড়া লাগাইবে।"

"ইহা ভাঙ্গিবার শক্তি অনেকের থাকে না। এই প্রকারে এক অজ্ঞতা-জনিত অভ্যাসের ফলে জীবন নষ্ট হয়। ইহা হইতে রক্ষা পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইল পবিত্র চিন্তা করা এবং সব কাজে সংযতভাবে চলা।"

শ্রীযুক্ত বুরো ডাক্তার এসকাণ্ডির লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"মন ও সংকল্প দ্বারা মিলনের ইচ্ছাকে আয়ত্তাধীন করা যায়। ইন্দ্রিয়ভোগের প্রয়োজনীয়তার পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়ভোগের ইচ্ছা শব্দ ব্যবহার করা দরকার, কারণ ইহা এমন কোনো অবশ্যকরণীয় কাজ নহে, যাহা ভিন্ন জীবন ধারণ করা অসম্ভব। অনেকে ইহাকে বিশেষ দরকারী ভাবিলেও বাস্তবিক ইহা দরকারী কাজ নহে। আমরা এ কথা বলিতে পারি না যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হইয়া অনন্যোপায় হইয়া পরিণত বয়সে আমরা ইহাতে লিপ্ত হই। বরং পূর্ব্ব হইতে সংকল্প করিয়া জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই আমরা ইন্দ্রিয়সেবায় নিরত হইয়া থাকি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আজীবন ব্রহ্মচর্য্য

বিবাহের পূর্ব্বে এবং পরে সংযম রক্ষা করিতে বলিয়া, এবং আত্ম-সংযম অসম্ভব বা অনিষ্টকর নহে বরং ইহা সম্ভব এবং মন ও শরীরের পক্ষে হিতকর ইহা দেখানর পর বুরো আজীবন ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে এক অধ্যায় লিখিয়াছেন। তাহার প্রথম প্যারাটি এই :—

"কাম-বাসনার গোলামী হইতে মুক্ত বীরদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সেই সব যুবক যুবতীর নাম লওয়া দরকার, যাঁহারা কোনো মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করা স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের এই দৃঢ় সংকল্পের ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে। কেহ অসহায় পিতামাতার সেবা করা কর্ত্তব্য মনে করেন, কেহ মাতৃপিতৃ-হীন ছোট ভাইভগ্নীর মাতাপিতার স্থান গ্রহণ করেন, কেহ জ্ঞানের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন, কেহ দরিদ্র অথবা রোগীর সেবায়, কেহ ধর্ম্ম বা নীতিশিক্ষা কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিতে চান। এই সংকল্প পালন করিতে গিয়া কাহাকে কাহাকেও পাশববৃত্তির সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিতে হয়, এবং ভাগ্যবশে কেহ কেহ ইন্দ্রিয় দ্বারা একরূপ প্রলুব্ধই হন না। তাঁহারা মনে মনে নিজের কাছে অথবা ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে সংকল্প তাঁহারা করিয়াছেন তাহা ত্যাগ করিবেন না এবং বিবাহের চিন্তা করা তাঁহাদের পক্ষে ব্যভিচার সদৃশ। অবস্থা বিশেষে বিবাহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও, মহৎ ও উদার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া বিবাহ না করার সংকল্পও কোনো কোনো

স্থলে ন্যায়সঙ্গত। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোকে কেহ বিবাহ করিতে বলিলে তিনি কহিয়াছিলেন, "আমার পত্নী চিত্রবিদ্যা বড় হিংসুটে; তিনি সতীন বরদাস্ত করবেন না।"

যাঁহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছেন, এইরূপ সকল প্রকার ইউরোপীয় বন্ধুর অভিজ্ঞতার বিবরণ বুরো সাহেব তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদের কথা উদ্ধৃত করিয়া আমি উপরের উক্তি সমর্থন করিতে পারি। শুধু ভারতেই শিশুকাল হইতে আমাদিগকে বিবাহের কথা শুনান হয়। বালকদের বিবাহ দেওয়া এবং তাহাদের জন্য যথেষ্ট অর্থ সম্পদ রাখিয়া যাওয়া ভিন্ন মাতাপিতার অন্য চিন্তা অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই। প্রথমটি অকালে বুদ্ধি ও শরীর ধ্বংস করে, দ্বিতীয়টি অলসতার প্রশ্রয় দেয় এবং অনেক সময় লোককে পরগাছার ন্যায় করিয়া তোলে। ব্রহ্মচর্য্য ও দারিদ্র্য-ব্রতের কঠোরতাকে আমরা অতিরঞ্জিত করিয়া থাকি এবং বলি ইহা পালন করিতে হইলে অসাধারণ শক্তির দরকার। এ দুটি জিনিষ আমরা মহাত্মা ও যোগীর জন্য রাখিয়া দি; একথা আমরা ভুলিয়া যাই, যেখানে সাধারণ লোকের অবস্থা হীন সেখানে সাচ্চা মহাত্মা ও যোগীর উদ্ভব সম্ভব নহে। সদাচারের গতি কচ্ছপের গতির ন্যায় ধীর অথচ অবাধ, কিন্তু দুরাচার শশকের ন্যায় দ্রুত চলে। এই হিসাবে পশ্চিমের ব্যভিচারের সওদা বিদ্যুৎগতিতে আমাদের নিকট আসে ও আপনার মনোমোহিনী চাকচিক্যের দ্বারা আমাদের চোখ ঝলসাইয়া দেয় এবং আমরা সত্যকে ভুলিয়া যাই। প্রতি মুহূর্ত্তে পশ্চিম হইতে যে তার আসিতেছে, প্রতিদিন পাশ্চাত্য দেশের মাল বোঝাই হইয়া যে জাহাজ এখানে পৌছিতেছে, এবং এইরূপে যে চটকদার জিনিষ আসিতেছে, তাহা দেখিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে আমরা লজ্জিত হইতেছি এবং দারিদ্র্য-ব্রতকে পাপ বলিয়া ঘোষণা

করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। পরন্তু ভারতবর্ষে আমরা পশ্চিমের যে রূপ দেখিতেছি, পশ্চিম সম্পূর্ণরূপে তাহা নহে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গগণ সেখানকার ভারতীয় বাসিন্দাদিগকে দেখিয়া, সমস্ত ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা পোষণ করিয়া যেমন ভুল করে, সেইরূপ ইউরোপ হইতে প্রতিদিন যে লোকজন ও মালপত্রাদি আসিতেছে, তাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে ধারণা করা আমাদের ভুল হইবে। যাহারা এই ভ্রমের পরদা সরাইয়া ভিতরের বস্তু দেখিতে সক্ষম, তাহারা দেখিতে পাইবেন যে, পশ্চিমেও পবিত্রতা এবং শক্তির একটি ক্ষুদ্র অথচ অফুরন্ত উৎস আছে। ইউরোপের মহা মরুভূমিতেও এরূপ সব ঝরণা আছে, যেখানে যে-কেহ ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র জীবন-বারি পান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে। সেখানকার শত শত স্ত্রীপুরুষ স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য ও দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এ জন্য কেহ ভুল করিয়াও গর্ব্ব অথবা হৈ চৈ করেন না। তাঁহারা নম্রতার সহিত স্ব-জন অথবা দেশসেবার জন্য ইহাতে ব্রতী হইয়া থাকেন। আমরা বলিয়া থাকি যে, ধর্ম্মের সহিত সংসারের সাধারণ কাজের কোনো সম্বন্ধ নাই এবং যে সব যোগী হিমালয় পর্ব্বতস্থ বন অথবা গুহায় একান্তবাস করিতেছেন ধর্ম্ম শুধু তাঁহাদের জন্য। যে আধ্যাত্মিকতা লোকের দৈনন্দিন জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য, যার প্রভাব সংসারের উপর পড়ে না, তাহা আকাশ কুসুম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সপ্তাহে সপ্তাহে যাহাদের জন্য 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' লেখা হয়, সেই সব যুবক যুবতী জানিয়া রাখুন যে, যদি তাহারা তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পবিত্র করিতে এবং দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে চান, তবে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা তাহাদের কর্ত্তব্য; তাহাদের ইহাও জানা দরকার, তাহারা যেরূপ শুনিয়া আসিতেছেন, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা তত কঠিন নহে।

বুরো সাহেব আরও বলেন, "বর্ত্তমান সমাজ-বিজ্ঞান যে পরিমাণে আমাদের নৈতিক অভিব্যক্তির অনুসরণ করিবে এবং যত গভীর-ভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত আমরা সমাজের বাস্তব সমস্যা আলোচনা করিতে পারিব, সমস্ত ইন্দ্রিয়সংযমের কাজে ব্রহ্মচর্য্যের সহায়তার মূল্য আমরা সেই পরিমাণে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব। বিবাহ করা আবশ্যক মানিয়া লইলেও, সকলে বিবাহ করিতে পারে না, অথবা সকলের পক্ষে ইহা আবশ্যক কিংবা উচিত বলা যায় না। যাহাদের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহারা ভিন্ন আরও তিন শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা ভিন্ন অন্য কোনো পথ নাই; (১) যে সব যুবক-যুবতী অর্থনৈতিক কারণে বিবাহ পিছাইয়া দেওয়া উচিত মনে করে; (২) যাহাদের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী জোটে না; (৩) যে সব লোকের এমন কোনো রোগ আছে যাহা সন্তান-সন্ততিতে সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা আছে, অথবা যাহারা অন্য কোনো কারণে বিবাহের চিন্তা বিলকুল ত্যাগ করিয়াছে। কোনো মহৎ কার্য্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব স্ত্রী-পুরুষ মানসিক ও শারীরিক শক্তির পূর্ণ অধিকারী এবং কখনও কখনও যথেষ্ট ধনসম্পদের মালিক হইয়াও আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে যাহারা বাধ্য হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাহাদের ব্রতপালনে অনেক সাহায্য হয়। স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মচারীর জীবন অসম্পূর্ণ মনে হয় না, বরং ইহাকে তাঁহারা মহৎ ও পরমানন্দপূর্ণ মনে করেন। তাঁহাদের ব্রতপালন দেখিয়া অবিবাহিত এবং বিবাহিত উভয় প্রকার ব্রহ্মচারীর নিজেদের ব্রতপালনে উৎসাহ আসে। তাঁহারা ইহাদের পথ-প্রদর্শক।

বিবাহ করার যোগ্য বয়স যাহাদের হয় নাই, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য

পালন করার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তাহারা যৌবনকাল সংযতভাবে কাটান সম্ভব মনে করিবে, বিবাহিতেরাও ইহা হইতে এই শিক্ষা পাইবে যে, যতই সঙ্গত হউক না কেন, তাহাদের স্বার্থচিন্তা যেন কখনও নৈতিক মহত্ত্ব ও প্রকৃত প্রেমের উচ্চতর আহ্বানকে ছাপাইয়া না উঠে।

ফোরষ্টার বলেন, "ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত বিবাহ-প্রথার মূল্য কমায় না; বরং ইহা দাম্পত্যবন্ধনের পবিত্রতা বৃদ্ধির সাহায্য করে; কারণ ইহা স্পষ্টভাবে দেখায় যে, প্রকৃতির তাড়না সত্ত্বে মানুষ ইন্দ্রিয়ের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে পারে। সাময়িক খেয়াল ও ইন্দ্রিয়ের তাড়নার সময় ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত বিবেকের ন্যায় কাজ করে। ব্রহ্মচর্য্য এই হিসাবে বিবাহিতের পক্ষে কবচ সদৃশ যে, ইহার কল্যাণে বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে বুঝিতে পারে, তাহারা একে অপরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সাধন মাত্র নহে এবং প্রলোভন সত্ত্বে তাহারা ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব করিতে সক্ষম। যাহারা চিরকৌমার্য্যকে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত উড়াইয়া দিতে চায়, তাহারা জানে না তাহারা কি করিতেছে। তাহারা দেখিতে পাইতেছে না, যে চিন্তার ধারা অনুসারে তাহারা আলোচনা করিতেছে, কঠোর তর্কশাস্ত্র অনুসারে সেই পথে চলিলে তাহাদিগকে বেশ্যাবৃত্তি ও বহুবিবাহ সমর্থন করিতে হইবে। বিষয়-বাসনার বেগ যদি অদম্যই হয়, তবে বিবাহিত লোকেই বা কিরূপে পবিত্রজীবন যাপন করিবে? তাহারা ভুলিয়া যায় যে, রোগ বা অন্য কোনো কারণে কখনও কখনও দম্পতির একজনের অক্ষমতার জন্য অপরের আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কেবল এই কারণেই ব্রহ্মচর্য্যের যত মহিমা আমরা স্বীকার করিব, এক-পত্নী-ব্রতের আদর্শও তত উচুতে স্থাপন করা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিবাহ সংস্কার

যে অধ্যায়ে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তার পরের অধ্যায়গুলিতে বুরো বিবাহের কর্ত্তব্যতা এবং বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দেওয়া সত্ত্বে তিনি বলিয়াছেন অধিকাংশ লোকের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে বলিয়া, তাহাদের বিবাহ করা কর্ত্তব্য। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিবাহের উদ্দেশ্য এবং বিবাহিত জীবনের নিয়মগুলি ঠিকরূপে বুঝিতে পারিলে জন্ম-নিরোধের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের পক্ষে বলার কিছুই থাকে না। কুশিক্ষার ফলেই বর্ত্তমান সময়ে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তথাকথিত অগ্রগামী লেখকগণ বিবাহপ্রথাকে উপহাস করিয়াছেন। বুরো ইহাদের মত আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন :—

"এই সকল ভুয়া নীতিবিদগণের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রকৃত নীতি-জ্ঞানের অভাব দেখা যায় ; এমন কি অনেক স্থলে ইহাদের মধ্যে খাঁটি সাহিত্যিকতারও অভাব লক্ষিত হয়। তবে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের পক্ষে মঙ্গলের কথা এই যে, ইহাদের মত বর্ত্তমান কালের প্রকৃত মনস্তত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদগণের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। চিন্তাশীল লোকে মনোরাজ্য এবং জীবনের গভীর তত্ত্বগুলি যে ভাবে আলোচনা করেন,

তার সহিত বর্ত্তমান কালের হৈ চৈ পূর্ণ সংবাদপত্র, উপন্যাস এবং থিয়েটারের বিরোধ।এই যৌনসম্বন্ধের আদর্শ বিষয়ে যত অধিক, এমন আর কিছুতে নয়।”

শ্রীযুক্ত বুরো সাহেব বিবাহ-নিরপেক্ষ অবাধ মিলনের পক্ষপাতী নহেন। তিনি মডেষ্টিনের সহিত একমত এবং ইঁহাদের মতে, ‘বিবাহ নরনারীর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ স্থাপন করে, এই মিলন চিরজীবনের জন্য এবং ইহা দ্বারা মানবজীবনের শ্রেয় ও প্রেয় একীভূত হয়। বিবাহ কেবলমাত্র একটি আইনের চুক্তি নয়, ইহা একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ইহার গুরুতর নৈতিক দায়িত্ব আছে। ইহার কল্যাণে বনের মানুষ সভ্য হইয়াছে। বিবাহ হইলেই নরনারী যাহা খুসি করিতে পারে এরূপ ভাবিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে; এমন কি স্বামী স্ত্রী যখন সন্তানোৎপাদনের নীতি লঙ্ঘন করেন না, তখনও কেবলমাত্র বিলাস বাসনা চরিতার্থ করার জন্য নানাপ্রকার মৈথুনভঙ্গীর আশ্রয় লওয়া অনুচিত। এই নিষেধ ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের যতখানি উপকার করিবে, সমাজেরও ততখানি উপকার করিবে। দেখিতে হইবে বিবাহ যেন সমাজের মঙ্গল ও পরিপুষ্টির কারণ হয়।’ লেখক বলিতেছেন, ‘পূর্ণ সংযমের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ বিবাহিত জীবনে সর্ব্বদাই উপস্থিত হয়, এবং এগুলি প্রকৃত প্রেমের বাধাস্বরূপ। এই বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় সর্ব্বদা সতর্ক থাকা যেন ইন্দ্রিয়ভোগের পরিমাণ বিবাহের উদ্দেশ্যানুমোদিত গণ্ডী অতিক্রম না করে। স্যালেসের সাধু ফ্রান্সিস্ বলেন, “তীব্র ঔষধ সেবন করা সব সময় বিপজ্জনক। কারণ যদি মাত্রা বেশী হইয়া পড়ে, অথবা ঔষধ প্রস্তুত করায় কোনো দোষ থাকে, তবে গুরুতর ক্ষতি হয়। বিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত এবং লাম্পট্য নিবারণ ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা

লাম্পট্যের ঔষধ বটে, কিন্তু এ বড় জোরালো ঔষধ; সুতরাং সাবধানে ব্যবহার না করিলে ইহাতে বিপদও ঘটে।"

কেহ কেহ বলেন, 'সকলেই স্বেচ্ছামত বিবাহ করিতে বা বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারে কিংবা কোনো প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া অবাধে ইন্দ্রিয়সেবা করিতে পারে।' শ্রীযুক্ত বুরো এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করার অথবা নিজের সুবিধার জন্য অবিবাহিত থাকার অধিকার সকলেরই আছে এরূপ মনে করা ভুল। আরও ভুল হইবে যদি আমরা মনে করি যে, খুসীমত বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার স্বামী-স্ত্রীর আছে। পরস্পরকে মনোনীত করিয়া লইবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে কিন্তু মনোনয়নের পূর্ব্বেই, নবজীবনের দায়িত্বভার যাহার সহিত একসঙ্গে বহন করিতে হইবে, তাহার সম্যক পরিচয় লওয়া এবং সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। কিন্তু বিবাহ হইয়া গেলে এবং একবার স্ত্রী পুরুষের দৈহিক মিলন সংঘটন হইলে তাহার বিপুল ফল কেবল দুটিমাত্র প্রাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া নানাদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান কালের উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের যুগে দম্পতির পক্ষে এই ফলের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়ত সম্ভব নয়; কিন্তু যখনই গৃহের ভিত্তি নড়িয়া যায় এবং উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়লালসা এক-বিবাহের মঙ্গলকর সংযমের স্থান অধিকার করে তখনই সমাজদেহে নানাপ্রকার পীড়া উপস্থিত হইয়া ঐ গুরুত্ব উপলব্ধি করায়। এসব বহুদূর বিস্তৃত ফলাফল এবং সূক্ষ্ম কার্য্যকারণ সম্বন্ধগুলি যিনি উপলব্ধি করিতে সক্ষম তিনি, মানুষের অন্যান্য প্রথার মত বিবাহ প্রথাও যে বিবর্ত্তনশীল ইহা জানিয়া ভীত হইবেন না, কারণ এ কথা নিশ্চিত যে, বিবাহবন্ধন যত নিবিড় হইবে, বিবাহের আদর্শও তত উন্নত হইবে।

পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার দাবী করিয়া আজকাল বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতার বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চলিতেছে, তাহাতে বিবাহবন্ধন যে অচ্ছেদ্য এই নীতির সামাজিক মূল্য আরও অধিক স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী যে নীতির সামাজিক মূল্য আমরা বুঝিতে পারি নাই পরন্তু যাহা আমাদের নিকট একটি ধর্ম্মের শাসন-মাত্র ছিল, তাহা যে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই একান্ত মঙ্গলকর—কালক্রমে ইহা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

"বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য এই নীতি একটি কথার কথা নহে, পরন্তু ইহার সহিত মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নিগূঢ় যোগ আছে। যাঁহারা ক্রমোন্নতিবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, কিসের দ্বারা মানবজাতির এই সর্ব্বজনবাঞ্ছিত অনন্ত উন্নতি সম্ভব হইতে পারে। ফোরষ্টার বলেন:—'দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি, স্বেচ্ছায় শাসন মানিয়া লইবার শিক্ষা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাগুণের উৎকর্ষ, স্বার্থপরতার দমন, ক্ষয়কর এবং উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপোষক বৃত্তির আক্রমণ হইতে মনকে রক্ষা করা—মানুষের এই সকল গুণই অধিকতর উন্নত সামাজিক জীবনের পক্ষে সতত এবং একান্ত আবশ্যক। সহসা প্রবর্ত্তিত অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের দরুণ মানব-সমাজে যে বিশৃঙ্খলা হওয়া সম্ভব, তাহা হইতে এই সকল গুণই আমাদিগকে রক্ষা করিবে। অর্থ-নীতিক্ষেত্রের নিশ্চলতা ও সাফল্যের সহিত অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ সামাজিক সহযোগিতার মিলন হইলেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির সামঞ্জস্য সাধিত হয়। এই সকল মূল কারণ উপেক্ষা করিয়া কোনো অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন আনিতে গেলে তাহা স্বতই কুফলদায়ী হইবে। অতএব যৌনসম্বন্ধের বিভিন্ন আদর্শগুলির প্রকৃত নৈতিক ও সামাজিক

মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর দিতে হইবে। কোন্ আদর্শে চলিলে আমাদের সমগ্র সামাজিক জীবনের গভীরতা ও শক্তি বৃদ্ধি হইবে? কিসে সর্ব্বদা আমাদের দায়িত্বজ্ঞান ও ত্যাগ প্রবৃত্তি বাড়িবে এবং লোভ, চঞ্চলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা কমিবে? এই সব দিক হইতে বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, এক-বিবাহ প্রথাই সকল উন্নত সভ্যতার অংশ এবং প্রকৃত উন্নতি বিবাহবন্ধনকে শিথিল না করিয়া নিবিড় করে। দায়িত্বজ্ঞান, সহানুভূতি, আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা এবং পরস্পরের নিকট শিক্ষালাভ করা—সামাজিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই সব গুণের শিক্ষাক্ষেত্র পরিবার। পরিবার শিক্ষার এই কেন্দ্রস্থানটি অধিকার করিয়া রহিয়াছে, কারণ পারিবারিক বন্ধন অচ্ছেদ্য ও চিরস্থায়ী এবং এই স্থায়িত্বের দরুণ পারিবারিক জীবন অন্য প্রকার জীবন অপেক্ষা গভীরতর, দৃঢ়তর এবং পরস্পর মিলনের পক্ষে অধিক উপযোগী। এক-বিবাহ প্রথাকে মানুষের যাবতীয় সমাজব্যবস্থার মর্ম্মস্থল বলা যাইতে পারে।"

তারপর বুরো অগস্ত কোঁত্-এর লেখা উদ্ধৃত করিতেছেন, "আমাদের হৃদয় এত চঞ্চল যে, ইহার চঞ্চলতা ও খেয়ালসমূহ সংযত রাখার জন্য সমাজকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়; নতুবা মানুষের জীবন কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর ও অর্থহীন অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র হইয়া পড়ে।

ডাক্তার টুলু বলেন, 'প্রণয়প্রবৃত্তি অদম্য এবং ইহার দাবী যে-কোনো উপায়ে পূরণ করিতে হইবে এই ভ্রান্ত ধারণা বহু দম্পতির সুখের অন্তরায় হইয়া থাকে। প্রবৃত্তির কবল হইতে ক্রমশ মুক্ত হওয়াই কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি ও তাহার ক্রমবিকাশের চিহ্ন স্বরূপ। বাল্যকালেই মানুষ তাহার স্থূল অভাবগুলি দমন করিতে চেষ্টা করিবে এবং বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে প্রবৃত্তি-সংযম শিখিতে হইবে। ইহা

কল্পনামাত্র নহে এবং ইহাকে কাজে পরিণত করাও অসাধ্য নহে। কারণ যাহাকে আমরা ইচ্ছাশক্তি বলি সেই শক্তির দ্বারা আমাদের স্বভাব গঠিত হয়। ধাতে সহ্য না বলিয়া যখন লোকে দায়িত্ব এড়াইতে চায়, তখন বুঝিতে হইবে ইহা দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে ব্যক্তি বাস্তবিক বলবান, উপযুক্ত সময়ে সে তাহার শক্তি প্রয়োগ করিতে জানে।

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

এই প্রবন্ধমালা শেষ করার সময় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বুরো মালথাসের মত যে ভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহা এখন আলোচনা করার দরকার নাই। "লোকসংখ্যা অতি বৃদ্ধি হইতেছে, এবং মানব জাতিকে যদি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হয়, তবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে" এই কথা প্রচার করিয়া মালথাস তাঁহার সমসাময়িক লোকদের তাক লাগাইয়া দিয়াছিলেন। পরন্তু মালথাস সংযম সমর্থন করিতেন, অন্যপক্ষে আজকালকার নয়া-মালথাস-পন্থীরা সংযম সমর্থন করেন না, কিন্তু ঔষধ-পত্র ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে লোককে পাশববৃত্তি চরিতার্থ করার ফল এড়াইতে বলেন। শ্রীযুক্ত বুরো নৈতিক উপায়ে অথবা ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা সন্তান নিরোধের কথা সানন্দে সমর্থন করেন এবং ঔষধপত্র ও যন্ত্রাদির তীব্র নিন্দা করেন। ইহার পর তিনি শ্রমিকদের অবস্থা ও জন্মহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মানবতার নামে যে ভয়ানক দুর্নীতি চলিতেছে, তাহা দমন করার উপায় আলোচনা করিয়া তাঁহার পুস্তক শেষ করিয়াছেন। তিনি বলেন, লোক-মত গঠন ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা দরকার—এবং এজন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তিনি লোকের ধর্ম্মভাব জাগরণের উপরই বেশী ভরসা রাখেন। একে তো দুর্নীতিকে মামুলী উপায়ে বন্ধ করা যায় না, তার উপর ইহাকে যখন ধর্ম্মনীতি বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং নীতিকেই দুর্ব্বলতা অন্ধবিশ্বাস ও

দুর্নীতি বলা হয়, তখন তো দুর্নীতিকে মোটেই ঠেকান যাইবে না। সন্তান-নিরোধের সমর্থকগণ ব্রহ্মচর্য্যকে শুধু অনাবশ্যক বলিয়া নিরস্ত হন না, বরং তাহারা ইহাকে ক্ষতিকর বলিয়া নিন্দা করেন। এ অবস্থায় নিরঙ্কুশ পাপাচার ঠেকাইতে গেলে শুধু ধর্ম্মই সুফল প্রদান করিবে। ধর্ম্মকে এখানে যেন সঙ্কীর্ণ অর্থে ধরা না হয়। ব্যক্তি ও সমাজ ধর্ম্মের দ্বারা যেরূপ প্রভাবান্বিত হয়, অপর কিছুর দ্বারা সেরূপ হয় না। ধর্ম্মগত জাগরণের অর্থ পরিবর্ত্তন, বিপ্লব অথবা পুনর্জন্ম। শ্রীযুক্ত বুরো সাহেব বলেন, ফরাসীজাতি যে নৈতিক অধঃপতনের পথে নামিতেছে, তাহা হইতে এরূপ কোনো মহাশক্তি ভিন্ন আর কিছুই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

*   *   *   *

এখন গ্রন্থকার ও তাহার পুস্তকের আলোচনা শেষ করিলাম। ফ্রান্স্ ও ভারতের অবস্থা একপ্রকার নহে। আমাদের সমস্যা অন্য প্রকার। কৃত্রিম উপায়ে গর্ভনিরোধের চেষ্টা ভারতে সার্ব্বজনীন হয় নাই। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও কদাচিৎ ইহার প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। আমার মতে ভারতে ইহা প্রচলনের কোনো কারণ ঘটে নাই। অধিক সন্তানসন্ততি থাকার জন্য কি ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অসুবিধায় পড়িয়াছে? দুই একটি উদাহরণ দিলে প্রমাণিত হইবে না যে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মহার অতি মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতে যাহাদের জন্য কৃত্রিম উপায়ে গর্ভনিরোধের কথা শুনিয়াছি, তাহারা বিধবা এবং অল্পবয়স্কা স্ত্রী। একক্ষেত্রে গোপন সহবাস নিষেধ করা হইতেছে না, কিন্তু জারজ সন্তানের জন্ম বন্ধ রাখার চেষ্টা হইতেছে; অন্যক্ষেত্রে বালিকা-পত্নীর উপর বলাৎকার বন্ধ করা হইতেছে

না, কিন্তু তাহার গর্ভসঞ্চারকে ভয় করা হইতেছে। তারপর থাকে অসুস্থ ও নিস্তেজ যুবকগণের কথা ; ইহারা নিজের অথবা অন্যের স্ত্রীর সহিত অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়সেবা করিতে চায় এবং পাপ জানিয়াও ইহাতে লিপ্ত হইয়া ইহার ফল এড়াইতে ইচ্ছুক। আমি বিশেষ জোর দিয়া বলিতে চাই, যাহারা ইন্দ্রিয়সেবা করিতে ইচ্ছুক অথচ সন্তানের জনক জননী হইতে অনিচ্ছুক, ভারতের জন্মসমুদ্র মধ্যে এরূপ সুস্থদেহ স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। তাহারা যেন তাহাদের কথা জাহির করিয়া না বেড়ায়, কারণ যদি ইহা ব্যাপক হইয়া পড়ে, তবে ইহাতে যুবক-যুবতীর সর্ব্বনাশ নিশ্চিত। এক মহা কৃত্রিম শিক্ষা-পদ্ধতি যুবকদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অনেক স্থলে আমরা অপরিণত বয়স্ক পিতামাতার সন্তান। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মানি না বলিয়া, আমাদের শরীর নষ্ট হইয়াছে। উত্তেজক মসলাযুক্ত অপুষ্টিকর খারাপ খাদ্য আমাদের পাকযন্ত্রকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে গর্ভনিরোধ করিয়া কিভাবে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি করার সুবিধা হইবে, সে শিক্ষা আমাদের দরকার নাই। যাহাতে ইন্দ্রিয়সংযম শিক্ষা হয় এরূপ শিক্ষা আমাদের নিরন্তর দরকার। যদি আমরা মানসিক ও শারীরিক শক্তি হিসাবে দুর্ব্বল থাকিতে না চাই, তবে সংযম পালন করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব এবং বিশেষ আবশ্যক, এ শিক্ষা যেন আদর্শ ও উপদেশ হইতে আমরা পাই। আমাদের মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা দরকার, যদি আমরা ক্ষীণকায় 'বামনের জাতি' হইতে ইচ্ছা না করি, তবে যে জীবনী-শক্তি আমরা দিন দিন নষ্ট করিতেছি তাহা সঞ্চয় করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে। আমাদের বালবিধবাদিগকে গোপনে পাপ করার পরামর্শ দিতে হইবে না, তাহাদিগকে বলিতে হইবে, তাহারা যেন প্রকাশ্যভাবে সাহসের সহিত আবার বিবাহ করার ইচ্ছা

প্রকাশ করে। অল্পবয়স্ক মৃতদার পুরুষের ন্যায় তাহাদেরও পুনর্ব্বিবাহের অধিকার আছে। লোকমত এমনভাবে গঠন করা দরকার, যাহাতে বাল্যবিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠে। আমাদের অস্থিরচিত্ততা, কঠিন ও অবিরাম শ্রমসাধ্য কাজে অনিচ্ছা, শারীরিক অযোগ্যতা খুব জাঁক-জমকের সহিত আরব্ধ অনুষ্ঠানেরও অসফলতা, এবং মৌলিকতার অভাব প্রভৃতির মূলে রহিয়াছে অত্যধিক বীর্য্যনাশ। আমি আশা করি, যুবকেরা ইহা বলিয়া আত্মবঞ্চনা করিবে না যে, সন্তানোৎপত্তি না হইলে শুধু ইন্দ্রিয়সেবার ফলে কাহারও কোনো অনিষ্ট হয় না, ইহা লোককে দুর্ব্বল করে না। আমি বলি সন্তানোৎপত্তির উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়সেবা করিলে যে দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি আসে, সন্তাননিরোধ করার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়সেবা করিলে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তি ক্ষয় হয়।

মন নরককে স্বর্গে এবং স্বর্গকে নরকে পরিণত করিতে পারে। যদি আমরা মনে করিতে আরম্ভ করি যে, ইন্দ্রিয়সেবা দরকার, ইহা অনিষ্টকর অথবা পাপজনক নহে, তবে আমরা নিরন্তর ইহা তৃপ্তি করিতে চেষ্টা করিব এবং ইহাকে দমন করা অসম্ভব হইবে। পরন্তু যদি আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে, ইন্দ্রিয়সেবা অনিষ্টকর, পাপজনক এবং অনাবশ্যক ও ইহা সংযত করা যায়, তবে আমরা দেখিব যে পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়দমন করা সম্ভব। প্রমত্ত পশ্চিম নূতন সত্য ও মানবের তথাকথিত স্বাধীনতার নামে স্বৈরাচারের তীব্র মদিরা এ দেশে পাঠাইতেছে, তাহা হইতে আমাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। অন্যপক্ষে যদি আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বাণী ভুলিয়া গিয়া থাকি, তবে পশ্চিমের জ্ঞানীদের যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সময় সময় আমাদের নিকট চুঁয়াইয়া পৌছে, আমরা যেন সেই ধীর স্থির বাণী শুনি।

শ্রীযুক্ত এণ্ডরুজ সাহেব 'অন্তর্জনন ও জনন' সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ সুন্দর একটি প্রবন্ধ আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। ইহা শ্রীযুক্ত উইলিয়াম লোফ্‌টাস কর্ত্তৃক লিখিত এবং ১৯২৬ সালের মার্চ্চ মাসের 'ওপেন কোর্ট' পত্রিকায় বাহির হয়। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে লিখিত। লেখক দেখাইয়াছেন, সকল প্রাণীর শরীরে এই দুটি কাজ চলে—শরীর-গঠন বা আভ্যন্তরীণ সৃষ্টি এবং জীবপ্রবাহ রক্ষার জন্য বাহিরের সৃষ্টি। এই প্রক্রিয়াকে তিনি যথাক্রমে অন্তর্জনন ও জনন নাম দিয়াছেন। অন্তর্জনন বা আভ্যন্তরীণ গঠন ব্যক্তির জীবনের ভিত্তি, এজন্য ইহা মুখ্য কাজ। জনন ক্রিয়া শরীর-কোষের আধিক্য হেতু হয়, এজন্য ইহা গৌণ। অতএব জীবন রক্ষার জন্য প্রথমত শরীর-কোষের পূর্ণতা দরকার; তারপর জননের কাজ চলিবে। যেখানে শরীর-কোষ অপূর্ণ, সেখানে প্রথমে শরীর গঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জনন ক্রিয়া বন্ধ রাখিতে হইবে। এইরূপে আমরা জনন-ক্রিয়া স্থগিত রাখার এবং সংযম বা ইন্দ্রিয়নিগ্রহের মূল পর্য্যন্ত পৌছিতে পারি। আভ্যন্তরীণ গঠন স্থগিত রাখিলে মৃত্যু অনিবার্য্য—ইহাই মৃত্যুর কারণ। শরীর-গঠনের কাজ বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক কহিয়াছেন, "সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার জন্য সভ্য মানুষ প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক বেশী বীর্য্যনাশ করে; ফলে শরীর গঠন ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় এবং ব্যাধি ও অকালমৃত্যু প্রভৃতি দেখা দেয়।

হিন্দু-দর্শনের সামান্য জ্ঞান যাহার আছে, শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেবের প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত নীচের অংশটি বুঝিতে তাহার কোনো অসুবিধা হইবে না। "অন্তর্জনন কলের কাজের ন্যায় সম্বন্ধশূন্য নহে; ইহাতে প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়; অর্থাৎ ইহার মধ্যে বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ দেখিতে পাই। ইহা চিন্তা করা অসম্ভব যে, জীবনের কাজ নির্জীব

কলের মত চলে। এ কথা সত্য যে আমাদের বর্ত্তমান চেতনা হইতে এই প্রাণশক্তির ক্রিয়া এত দূরে যে, দেখিয়া মনে হয়, মানুষ অথবা অপর জীবের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ইহা নিয়ন্ত্রিত হয় না। পরন্তু সামান্য চিন্তা করিলেই ধারণা করিতে পারি যে, বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের বাহিরের গতি-বিধি ও কাজ যেরূপ বুদ্ধির নির্দ্দেশ অনুসারে ইচ্ছাশক্তি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, শরীর-গঠনের উপর সেরূপ বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির প্রভাব থাকা চাই। মনোবিজ্ঞানবিদ ইহাকে অগোচর বলেন। আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক সাধারণ চিন্তার বাহির হইলেও ইহা আমাদের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের চৈতন্যও সময় সময় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু ইহা আপনার কাজে এরূপ জাগ্রত ও সাবধান যে, ক্ষণকালের জন্যও ইহা নিদ্রিত হয় না।

শুধু শারীরিক সুখের জন্য বিষয়ভোগকরিলে আমাদের এই অগোচর ও অবিনশ্বর অংশের যে মহান ক্ষতি হয়, তাহার পরিমাণ কে করিতে পারে? জননের ফল মৃত্যু। সঙ্গমের ফলে পুরুষ মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয় এবং প্রসবক্রিয়া নারীর পক্ষে মৃত্যুতুল্য। এজন্য লেখক বলেন, "যাহারা অনেকাংশে সংযমী অথবা সম্পূর্ণ ব্রহ্মচারী, তাহারা পুরুষত্ব ও জীবনীশক্তিসম্পন্ন এবং রোগহীন হইবেই। যে বীজকোষ ঊর্দ্ধগতি হইয়া শরীর গঠন করিবে, তাহাকে নামাইয়া আনিয়া জনন অথবা শুধু ভোগের কাজে লাগাইলে, দেহের ক্ষয় পূরণে বাধা পড়ে; ইহাতে ধীরে ধীরে, কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে, দেহের মহা ক্ষতি হয়। এই সব ব্যাপার স্ত্রী-পুরুষের ইন্দ্রিয়সেবার ভিত্তি। ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় দমন করিবার শিক্ষা না পাইলেও সংযম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়—অথবা কোনো প্রকারে কিছু না কিছু সংযমের মূল নীতি বুঝা যায়। লেখক রাসায়নিক দ্রব্য অথবা যন্ত্রপাতির সহায়তা

লওয়ার বিরোধী। তিনি বলেন, "ইহার ফলে আত্মসংযমের কোনো তাগিদ থাকে না এবং বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে ইচ্ছার হ্রাস না হওয়া অথবা বৃদ্ধত্বের অক্ষমতা না আসা পর্য্যন্ত বীর্য্যনাশ করা সম্ভব হয়। ইহা ভিন্ন বিবাহিত জীবনের বাহিরেও ইহার একটা প্রভাব পড়ে। ইহা হইতে অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল এবং নিষ্ফল মিলনের দরজা খুলিয়া যায়; ইহা আধুনিক শিল্প, সমাজ ও রাজনীতি অনুসারে বিপদসঙ্কুল। পরন্তু এখানে এ সম্বন্ধে পুরাপুরি বিচার করার কোনো দরকার নাই। তবে ইহা বলা যথেষ্ট যে, কৃত্রিম উপায়ে গর্ভনিরোধের ফলে বিবাহিত অবিবাহিত উভয়বিধ জীবনে, অনুচিত ও অত্যধিক ইন্দ্রিয়-সেবার সুবিধা হয়, এবং যদি আমার পূর্ব্বের শরীর-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পেশ করা যুক্তি ঠিক হয়, তবে ইহাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির ক্ষতি নিশ্চিত।

শ্রীযুক্ত বুরো যে কথা বলিয়া তাঁহার পুস্তক শেষ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারতীয় যুবকের অন্তরে গাঁথিয়া রাখা উচিত। সে কথা এই, "যাহারা সংযমী ভবিষ্যৎ সেই সব জাতির হাতে।"

পরিশিষ্ট (ক)

জনন ও অন্তর্জনন *

১। প্রাণীজগতে জনন

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এককোষাত্মক প্রাণ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণীগণ একটি দুইভাগ হইয়া নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। খাদ্য গ্রহণ করিয়া ইহারা বাড়িতে থাকে এবং যতদূর সম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, প্রথমে ইহাদের প্রাণকেন্দ্র তাহার পর দেহটিও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ যখন ইহারা জল ও খাদ্য পায় তখন এই প্রকারেই ইহাদের সমস্ত প্রাণশক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু জল ও খাদ্য না পাইলে, অনেক সময় দুইটি জীবকোষকে পুনর্মিলিত হইতে দেখা যায়; তাহার ফলে পুনর্যৌবন প্রাপ্তি হইতে পারে কিন্তু নূতন জীবসৃষ্টি হয় না।

বহুকোষাত্মক প্রাণীদের মধ্যে আহার ও বৃদ্ধি ছাড়া আর একটি নূতন জিনিষ দেখা যায়। দেহের বিভিন্ন কোষসকল বিভিন্ন দৈহিক কার্য্যে নিযুক্ত হয়—কতকগুলি আহার গ্রহণ করে, কতকগুলি তাহা দেহের বিভিন্ন অংশে বণ্টন করে, এবং কতকগুলি চলাচলের কার্য্য করে, এবং কতকগুলি, যথা ত্বক, আত্মরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। যে সকল কোষ নূতন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় একটি ভাগ হইয়া দুইটি হয় না, কিন্তু দেহের অপেক্ষাকৃত অন্তঃস্থলে যে সকল কোষ

---

* চিকাগো হইতে প্রকাশিত 'ওপোন কোর্ট' নামক পত্রিকায় ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে উইলিয়াম লোফ্‌টাস হেয়ার কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ হইতে।

থাকে, সেগুলি পূর্ব্বের ন্যায়ই একটি ভাগ হইয়া দুইটি হয়। যে সকল কোষের মধ্যে কার্য্যানুসারে বহু প্রকার বিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা অন্তঃস্থলের কোষদিগকে রক্ষা করে। যে সকল কোষ পূর্ব্বের ন্যায় একটি ভাগ হইয়া দুইটি হয়, তাহারা এখন দেহের মধ্যেই ঐরূপ হয়—অবশেষে কতকগুলি দেহের বাহির হইয়া যায়। কিন্তু এই সকল কোষের একটি নূতন শক্তি লাভ হয়। পূর্ব্বে যেমন ইহারা একটি ভাগ হইয়া দুইটি পৃথক কোষ হইয়া যাইত, এখন সেরূপ না হইয়া অন্তর্ভেদ হয় অর্থাৎ পৃথক না হইয়া একের মধ্যেই একাধিক প্রাণকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। বহুকোষাত্মক প্রাণীগণের নিজ নিজ জাতির আকার ও আকৃতি না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ চলিতে থাকে। কিন্তু এই সকল প্রাণীর দেহে আমরা একটি নূতন ব্যাপার দেখিতে পাই। নবসৃষ্ট প্রাণকোষগুলি কেবলমাত্র অথবা মুখ্যত পৃথক প্রাণী সৃষ্টির জন্য দেহের বাহিরে আসে না; অপরপক্ষে তাহারা দেহের নানাকার্য্যেরত বিভিন্ন কোষসমষ্টির জন্য যথাপ্রয়োজন কোষ জোগাইয়া থাকে। সুতরাং জীবকোষগুলি দুই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে, প্রথমত দেহের ভিতরের সৃষ্টি দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন, দ্বিতীয়ত দেহের বাহিরের সৃষ্টি দ্বারা বংশ অথবা জাতিরক্ষা। এই দুই প্রকারের ক্রিয়া আমরা সূক্ষ্মভাবে আলাদা করিয়া দেখিতে পারি এবং ইহাদের যথাক্রমে অন্তর্জনন এবং জনন নামে অভিহিত করিতে পারি। কিন্তু একটি গুরুতর কথা এখানে মনে রাখা দরকার। অন্তর্জনন ক্রিয়ার উপর প্রত্যেক প্রাণীর অস্তিত্ব নির্ভর করে, এজন্য ইহা মুখ্য ও প্রয়োজনীয়; জননক্রিয়া জীবকোষের বাহুল্য হেতু হইয়া থাকে, অতএব ইহা গৌণ। এই দুই ক্রিয়াই খাদ্যগ্রহণ অথবা পুষ্টির উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে। কারণ পুষ্টির অল্পতা হইলে অন্তর্জনন কমিয়া যায় এবং জননের আবশ্যকতা অথবা সম্ভাবনাও থাকে না। প্রথমত

অন্তর্জনন, দ্বিতীয়ত জননের জন্য জীবকোষগুলির পোষণ করাই এই স্তরে জীবনীশক্তির কার্য্য। যদি পুষ্টির অল্পতা হয়, তবে প্রথমে অন্ত-র্জননের দাবীই পূরণ করিতে হইবে এবং জননক্রিয়া বন্ধ রাখিতে হইবে। এইরূপে আমরা প্রাণীগণের জননক্রিয়া স্থগিত রাখার মূল কারণ জানিতে পারি এবং সেই মূল ধরিয়া মানুষের যৌননীতির উন্নত স্তরগুলির যথা ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের অর্থ বুঝিতে পারি। অন্তর্জনন ক্রিয়া কখনও বন্ধ করা চলে না, কারণ তাহা করিলেই মৃত্যু। মৃত্যুর স্বাভাবিক কারণ কি তাহাও এরূপে দেখা গেল অর্থাৎ অন্তর্জনন ক্রিয়া বন্ধই মৃত্যুর স্বাভাবিক কারণ।

২। প্রাণীজগতে অন্তর্জনন

যৌনবিভাগ বা লিঙ্গভেদ মনুষ্য ও জন্তুগণের মধ্যে প্রকৃতিগত হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাহা আলোচনা করার পূর্ব্বে অযৌন-জনন এবং যৌন-জননের মধ্যবর্ত্তী যে জননরীতি দেখা যায় তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে 'হারমাফ্রোডাইট' (দ্বিলিঙ্গ) এই পৌরাণিক নাম দিয়াছেন, কারণ ইহাতে একাধারে স্ত্রী-পুরুষের ক্রিয়া হইয়া থাকে। এখনও এরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট কয়েক প্রকার জীব আছে। ইহাদের দেহের মধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে জীবকোষের বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ জীবকোষ-সকল একেবারে দেহের বাহিরে না আসিয়া সাময়িকভাবে দেহের এক অংশ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অপর অংশে যুক্ত হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত ভিন্ন প্রাণীরূপে বাঁচিয়া থাকার শক্তি লাভ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ ভাবে পুষ্ট হইতে থাকে।

উৎক্ষেপণের সময় পর্য্যন্ত জনকদেহের যতখানি পরিণতি হইয়াছে,

অন্তত ততখানি পরিণতি লাভের সম্ভাবনা লইয়াই সন্তানের জন্ম হয়। এককোষাত্মক বহুকোষাত্মক অথবা দ্বিলিঙ্গ—সকল প্রকার প্রাণীর বৃদ্ধি সম্বন্ধে একথা খাটে। সুতরাং ক্রমবিকাশ মূলে জাতিগত নহে, ইহা প্রাণীগত অথবা ব্যক্তিগত। কোনো প্রাণী যখন সন্তানের জন্ম দেয়, তখন সে নিজে পূর্ব্বের অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে থাকে অথবা থাকিতে পারে ; ফলে তাহার সন্তানও সেই স্তর পর্য্যন্ত স্বভাবত পৌছিতে সমর্থ। সন্তান জন্মদানের কাল প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষে এক নহে ; তবে বলা যাইতে পারে, প্রাণীগণের দৈহিক পূর্ণতালাভের পর হইতে শরীরের শক্তি কমিতে আরম্ভ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সন্তান জন্ম দিবার প্রশস্ত কাল। দৈহিক পূর্ণতালাভের পূর্ব্বে অথবা দেহের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় জাত সন্তান অবস্থানুযায়ী দুর্ব্বল ও নিকৃষ্টদেহ পাইয়া থাকে। শরীরের এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতেই আমরা এই যৌন-নীতি আবিষ্কার করিতে পারি যে, যদি অন্তর্জননের হানি না করিয়া সুসন্তান দ্বারা বংশ রক্ষা করিতে হয় তবে কেবলমাত্র দেহের পূর্ণাবস্থায় জননক্রিয়া করা উচিত।

দ্বিলিঙ্গ জীব সৃষ্টির পরে কিভাবে স্ত্রী-পুরুষের লিঙ্গভেদ হইয়াছে, সে ইতিহাস আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করি না, কারণ ইহার সত্যতা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। স্ত্রী-পুরুষভেদ-সমন্বিত প্রাণী-গণের একটী নূতন লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। তাহা এই—দ্বিলিঙ্গ জীবের দুই অংশ এখন যে কেবল পৃথক-শরীর হইয়াছে তাহা নয়, পরন্তু ইহারা এখন অপরের সাহায্য ব্যতীত বীজকোষ বা শুক্রকোষ উৎপন্ন করিতে থাকে। পুরুষ জীব অন্তর্জননের জন্য বীজকোষ উৎপন্ন করে—আবার এই বীজকোষই জননক্রিয়ার জন্য বাহিরে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং পুরুষের বীর্য্য বলিয়া অভিহিত হয়। স্ত্রী-জীবও তদ্রূপ

বীজকোষ উৎপন্ন করে, তবে স্ত্রী কর্ত্তৃক উৎপন্ন অণ্ড সকল বাহিরে নিক্ষিপ্ত না হইয়া দেহের ভিতরেই থাকে এবং সেখানে ইহা পুরুষ-বীর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভ উৎপাদন করে। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অন্তর্জনন একান্ত আবশ্যকীয়। গর্ভ সঞ্চারের পর হইতে প্রতি মুহূর্ত্তেই অন্তর্জননক্রিয়া ক্রমশ অধিক পরিমাণে চলিতে থাকে। দেহের পূর্ণতা-লাভের পর মানুষের মধ্যে জননক্রিয়া হইতে পারে; ইহাতে জাতিরক্ষা হয় বটে, কিন্তু ব্যক্তির উপকার যে হয় তাহা বলা যায় না। অন্তর্জনন বন্ধ হইলে অথবা যথারূপ না হইলে, নিম্নশ্রেণীর জীবের ন্যায় মানুষেরও রোগ অথবা মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। মানুষের ভিতরেও ব্যক্তি এবং ভবিষ্যৎ জাতির স্বার্থ এইরূপ পরস্পরবিরোধী হইতে দেখা যায়। যদি বীজকোষের আধিক্য না থাকে, তবে জননের জন্য ইহা ব্যয় করিলে অন্তর্জননের উপাদান কম পড়ে। প্রকৃতপক্ষে সভ্য মানব-সমাজে জাতি-রক্ষার জন্য যতটা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত যৌন-সম্ভোগ চলে এবং এরূপে অন্তর্জনন ব্যাহত হয়—ফলে রোগ ও অকালমৃত্যু দেখা দেয়।

মানবদেহ সম্বন্ধে আর একটু বিশেষ আলোচনা করা যাউক। আমরা পুরুষের দেহকেই নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিব, যদিও স্ত্রীদেহ সম্বন্ধে একই কথা খাটে।

কেন্দ্রীয় বীজকোষাগারই প্রাণের আদিম ও নিগূঢ়তম আশ্রয়। প্রথম হইতেই ভ্রূণ ক্ষণে ক্ষণে এবং দিন দিন জীবকোষবৃদ্ধির দ্বারা বাড়িতে থাকে; এই জীবকোষগুলি মাতার শরীর-নিস্থত রসের দ্বারা পুষ্ট হয়। এখানেও জীবকোষগুলিকে পোষণ করাই জীবনের ধর্ম্ম। এই জীবকোষ সকল যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক অথবা স্থায়ী আকার এবং কার্য্যভার গ্রহণ করে। মাতৃদেহ হইতে জন্মলাভ করার পরও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। ভ্রূণ মাতৃগর্ভে নাড়ী দ্বারা

খাদ্য গ্রহণ করিত, তাহার পরিবর্ত্তে শিশু এখন মুখ দিয়া খায়। জীবকোষগুলির পুষ্টি সাধনের জন্যই এই খাদ্য গ্রহণ। এই জীবকোষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং শরীরের যখন যে অংশে প্রয়োজন তখন সেই অংশে গিয়া তাহারা অকর্ম্মণ্য তন্তুগুলির সংস্কার করিয়া থাকে। মূলকেন্দ্র হইতে জীবকোষগুলি রক্তে আসে এবং রক্তের সহিত শরীরের সর্ব্বত্র যায়। জীবকোষগুলির এক একটি সমষ্টি এক একটি দৈহিক ক্রিয়ার জন্য নিযুক্ত হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের সংস্কারকার্য্য করিয়া থাকে। এই জীবকোষগুলি নিজেরা সহস্রবার মরিয়া 'জীবকোষের সমাজকে' অর্থাৎ দেহপ্রাণকে বাঁচাইয়া রাখে। ইহাদের 'মৃত দেহ' উপরের দিকে আসিয়া শক্ত হইয়া অস্থি, দন্ত, চর্ম্ম, কেশ প্রভৃতিতে পরিণত হয় এবং দেহকে রক্ষা ও বলবান করে। ইহাদের মৃত্যুর বিনিময়েই দেহের উচ্চতর জীবন এবং তার উপর নির্ভরশীল অপর যাহা কিছু বাঁচিয়া থাকে। জীবকোষসকল যদি খাদ্য গ্রহণ না করিত, যদি ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইত, যদি ইহারা শরীরের বিভিন্ন অংশে না যাইত এবং বিভিন্ন ক্রিয়া না করিত এবং পরিশেষে না মরিত তবে দেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না।

পূর্ব্বকথিত মতে দেখা যায় যে, বীজকোষ হইতে দুই প্রকার প্রাণের উদ্ভব হয়: (১) আভ্যন্তরিক বা অন্তর্জননীয় (২) বাহ্যিক বা জননীয়। অন্তর্জননই দেহের জীবনের ভিত্তি এবং অন্তর্জনন ও জননের উপাদান একই মূল হইতে আহৃত হয়। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে কিরূপে অন্তর্জনন ও জনন অবস্থাবিশেষে পরস্পরবিরোধী হইয়া থাকে।

৮। অন্তর্জনন ও অগোচর

অন্তর্জনন ক্রিয়ার প্রকৃতি যান্ত্রিক নহে, পরন্তু একটি জীব ভাগ হইয়া দুইটি হইবার প্রণালীর ন্যায় ইহা জৈবিক; অর্থাৎ ইহাতে বৃদ্ধি

এবং ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ দেখা যায়। যে শক্তিতে এক দেহ হইতে আর এক দেহ উৎপন্ন হইতেছে, দেহকোষসকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে—তাহার প্রকৃতি যে বিলকুল নির্জীব কলের ন্যায় তাহা ধারণা করা অসম্ভব। একথা সত্য যে, আমাদের বর্ত্তমান চেতনা হইতে এই প্রাণশক্তির কার্য্য এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে যে, দেখিয়া মনে হয়, প্রাণশক্তির কার্য্যের উপর মানুষের অথবা অপর জীবের ইচ্ছাশক্তির কোনো প্রভাব নাই। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, যেমন পরিণতদেহ মানুষের ইচ্ছাশক্তি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া তাহার সকল কার্য্য এবং অঙ্গসঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি দেহগঠনের প্রথম অবস্থার ক্রিয়া সকল অবস্থা উপযোগী এক ধরণের বুদ্ধি দ্বারা চালিত একপ্রকার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মনস্তত্ত্ববিদগণ আজকাল ইহার 'অগোচর' নাম দিয়াছেন। ইহা আমাদের অস্তিত্বের অংশ। যদিও আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তাধারার সহিত ইহার যোগ নাই, তথাপি ইহা সদা জাগ্রত এবং আপন কার্য্যে সদা তৎপর। আমাদের নিদ্রার সময় গোচর মন নিদ্রিত হয় কিন্তু এই অগোচরের নিদ্রা নাই।

অন্তর্জননের ক্রিয়াসমূহ অগোচরের কর্ত্তৃত্বাধীনে হয়। গর্ভসঞ্চারের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহা বীজকোষ সকলকে দেহের রক্তে সঞ্চারিত করে এবং শরীরের যেখানে যখন প্রয়োজন পাঠাইয়া দেয়। যদিও বহু বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদের মত অন্যরূপ, তথাপি আমি বলিতে চাই যে, অগোচরের কার্য্য জীব লইয়া, জাতি লইয়া নয়, সুতরাং ইহার প্রধান লক্ষ্যের বিষয় অন্তর্জনন। 'অগোচর' জাতির ভালমন্দের জন্য ব্যস্ত, এ কথা কেবল এক অর্থে বলা যাইতে পারে—তাহা এই যে, অগোচরের দ্বারা জীবের দেহগঠন একবার যে উন্নত অবস্থায় নীত হয়, অগোচর তাহাকে স্থায়ী করার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া

তুলিতে পারে না—গোচর মনের ইচ্ছাশক্তির সাহায্য লইয়াও ইহা প্রাণীকে অনন্তকাল ধরিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। সুতরাং মৈথুনাসক্তির দ্বারা ইহাকে সৃষ্টি করিতে হয়। মৈথুনাসক্তিতে গোচর এবং অগোচর মনের ইচ্ছাশক্তি একত্র মিলিত হয় এরূপ বলা যাইতে পারে। মৈথুনে যে আনন্দ আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, মৈথুনকার্য্যের দ্বারা জীবের উদ্দেশ্য ভিন্ন অপর কোনো (অর্থাৎ জাতির) উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। এই মৈথুনের আনন্দের জন্য জীবকে অজ্ঞাতে বড় বেশী দাম দিতে হয়। হিব্রুলেখক ঈশ্বরের মুখ দিয়া এই সত্যই প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর ইভকে জলদগাম্ভীর স্বরে বলিতেছেন "বহু গর্ভ-সঞ্চারের দ্বারা তোমার দুঃখ বৃদ্ধি পাইবে; গভীর যন্ত্রণায় তুমি সন্তান প্রসব করিবে।"

৪। জনন ও মৃত্যু

বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা উচিত বিবেচনা করি না, কিন্তু এই বিষয়টি এত গুরুতর এবং এ সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা এত বেশী যে, আমি কয়েকজন পণ্ডিতের লেখা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি। রে ল্যাংকেষ্টার বলেন :—

"এককোষাত্মক নিম্নতম জীবের দেহগঠন এবং বংশবৃদ্ধির দ্বিভাগ প্রণালীর ফল এই যে, ইহাদের মধ্যে মৃত্যু পৌনপৌনিক স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।"

উইজম্যান লিখিয়াছেন :—"বহুকোষাত্মক জীবের মধ্যেই মৃত্যু স্বাভাবিক ব্যাপার; এককোষাত্মক জীবের মধ্যে স্বাভাবিক মৃত্যু নাই—ইহাদের বৃদ্ধির এমন কোনো শেষ অবস্থা নাই, যাহাকে মৃত্যু

বলা যাইতে পারে এবং নূতন প্রাণীর সৃষ্টির সঙ্গে পুরাতনের মৃত্যু হয় না। একটি এককোষাত্মক প্রাণী বিভক্ত হইয়া দুইটি হইলে, দুই ভাগই সমান হয়, একটির অপেক্ষা অপরটি অধিক বৃদ্ধ এ কথা বলা যায় না। এইরূপে একটি অনন্ত জীবধারা চলিতে থাকে—যাহার প্রত্যেকটি জীব নিজ জাতির সমবয়সী, প্রত্যেকটির অনন্তকাল ধরিয়া বাঁচিয়া থাকার শক্তি আছে, যাহার প্রত্যেকটী পুনঃ পুনঃ দুইভাগ হয় কিন্তু কখনও মরে না।"

প্যাট্রিক গেডিসের "যৌন ক্রমবিকাশ" নামক গ্রন্থ হইতে উপরের উদ্ধৃত অংশগুলি লওয়া হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন; "অতএব আমরা বলিতে পারি যে, মৃত্যুই দেহের মূল্য—দেহ লাভ করিলে এবং দেহ থাকিলে মৃত্যু আগে হউক পরে হউক একদিন আসিবেই। যাহাতে বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য কোষসকলের মধ্যে শ্রমবিভাগ দেখা যায় দেহ বলিতে এখানে সেইরূপ একটি জটিল জীবকোষ বুঝাইতেছে।"

উইজম্যানের মূল্যবান বাক্য পুনরায় উদ্ধৃত করিতেছি। "দেহকে জীবশক্তির প্রকৃত আশ্রয়ের অর্থাৎ জননকারী জীবকোষসকলের একটি নিতান্ত গৌণ উপাঙ্গ বলিয়াই মনে হয়।"

রে ল্যাংকেষ্টারেরও সেই ধারণা। তিনি বলেন, "বহু-কোষাত্মক প্রাণীগণের মধ্যে কতকগুলি জীবকোষ দেহের মূল উপাদানভূত জীবকোষগুলি হইতে ভিন্ন হইয়া আসে। এই ভাবে দেখিলে উচ্চতর প্রাণীগণের মরণশীল দেহগুলিকে সাময়িক ও গৌণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কেবলমাত্র কিছুকালের জন্য মৃত্যুহীন ভাগজাত কোষগুলির ধারণ ও পুষ্টিসাধন করাই ইহাদের কাজ।'

কিন্তু এই সকল তথ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং সম্ভবত সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর তথ্য এই যে, উচ্চশ্রেণীর জীবসমূহের মধ্যে জনন

এবং মৃত্যুর মধ্যে অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। এ বিষয়ে বহু বৈজ্ঞানিক বিশেষ নিশ্চয়তার সহিত পরিষ্কার ভাবে লিখিয়াছেন, জননের নিশ্চিত পরিণাম মৃত্যু। অনেক শ্রেণীর জীবের মধ্যে ইহা সুস্পষ্টই দেখা যায়। সন্তান-জন্মদানের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের মধ্যে স্ত্রী অথবা পুং জীবটির মৃত্যু হয়। সন্তান জন্মদানের পরেও জীবন থাকা সকলক্ষেত্রে দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই না। মৃত্যু সম্বন্ধে মহাকবি গেটে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি জননের সহিত মৃত্যুর যে কিরূপ অমোঘ ও নিকট সম্বন্ধ তাহা দেখাইয়াছেন। একদিক দিয়া জনন ও মৃত্যু অনুরূপ—উভয়ই দেহীর পক্ষে পরম ক্ষয়সঙ্কট বলা যাইতে পারে। প্যাট্রিক গেডিস্ এ বিষয়ে লিখিয়াছেন :—"জননের সহিত মৃত্যুর সম্বন্ধ সুস্পষ্ট কিন্তু সাধারণত লোকে ইহাকে ভুলভাবে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। লোকে বলে, জীবমাত্রেরই মৃত্যু আছে, সুতরাং জনন না করিলে জাতি লোপ পাইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের ভালমন্দের উপর এই জোর দেওয়াটার চেষ্টা আমাদের কর্ম্মের পরবর্ত্তী কল্পনাপ্রসূত। জীবের ইতিহাস আলোচনা করিলে যে সত্য অবিষ্কার করা যায় তাহা এই যে, মরিতে হইবে বলিয়া যে জীবগণ জনন করে তাহা নহে, জনন করিতে হয় বলিয়াই জীবগণের মৃত্যু ঘটে।"

গেটে বলিয়াছেন, "মৃত্যু আছে বলিয়া বংশবৃদ্ধি আবশ্যক এ কথা বলা চলে না, বরং সন্তান জন্মদানের অবশ্যম্ভাবী ফল মৃত্যু।"

বহু নিদর্শন দেখাইয়া নীচের প্রণিধানযোগ্য কথাগুলি লিখিয়া গেডিস্ তাহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। "উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে সন্তানজন্মহেতু মৃত্যু-সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়াছে সত্য কিন্তু জননক্রিয়ার সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ মৃত্যু মানুষেরও হইতে পারে। পরিমিত যৌন-সম্ভোগের ফলেও কিরূপ সাময়িক ক্লান্তি আসে এবং যৌনসম্ভোগের ফলে

শারীরিক শক্তির ক্ষয় হইলে সর্ব্বপ্রকার ব্যধির সম্ভাবনা কিরূপ অধিক তাহা সুবিদিত।"

এই আলোচনার সার কথা সংক্ষেপে এবং নিশ্চিতভাবে ইহা বলা যাইতে পারে, মনুষ্যজীবনে পুরুষের পক্ষে যৌনক্রিয়া এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে সন্তানপ্রসব মুখ্যত ক্ষয়কারী (মৃত্যুর দিকে পদক্ষেপ)।

অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবার ফল যে শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর, সে বিষয়ে দীর্ঘ একটি অধ্যায় লেখা যাইতে পারে। পূর্ণ-সংযমী এবং অনেকাংশে সংযমী মানবগণ স্বভাবতই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের পুরুষত্ব ও জীবনীশক্তি অব্যাহত থাকে এবং তাহারা সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। শ্রুতিকটু হইলেও তাহার একটি প্রমাণ এই যে, পুরুষের অনেক রোগে নিস্তেজ দেহে কৃত্রিম উপায়ে বীর্য্য প্রবেশ করাইয়া রোগ দূর করা হয়।

এই অধ্যায়ের সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লইতে পাঠকের মনে একটু খটকা লাগিতে পারে। বহু সন্তানের জনক হইয়াও বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত সুস্থদেহে জীবিত রহিয়াছে এরূপ লোককে কেহ কেহ নজীররূপে দেখাইবেন; বিবাহিতেরা অবিবাহিতদের অপেক্ষা বেশীদিন বাঁচে এইরূপ সিদ্ধান্তসূচক হিসাবপত্রের উল্লেখও কেহ কেহ করিবেন। কিন্তু যদি আমাদের মৃত্যু সম্বন্ধীয় ধারণা বিজ্ঞানসম্মত হয় তবে এই দুই যুক্তির কোনোটির মূল্য থাকে না। কারণ মৃত্যু এমন একটী ঘটনা নহে, যাহা কেবল জীবনের অন্তে ঘটিয়া থাকে; পরন্তু বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইয়াছেন যে, মৃত্যু একটি প্রবহমান ঘটনাবিশেষ—ইহা জীবনের প্রথম হইতেই আরম্ভ হইয়া প্রতিক্ষণই জীবনের পাশে পাশে চলিতেছে। বৃদ্ধি অথবা সংস্কার এবং ধ্বংস অথবা ক্ষয়, যথাক্রমে জীবন ও মৃত্যুর শক্তিতে হইয়া থাকে। প্রাণীগণের শৈশবে ও যৌবনে জীবনশক্তি

আগে চলে, মধ্যবয়সে জীবনশক্তি ও মৃত্যুশক্তি সমানে চলে, শেষের দিকে মৃত্যুশক্তি আগে চলে এবং অন্তিমে তাহারই জয় হয়। যাহা কিছু এই মৃত্যুশক্তির জয়ের সাহায্য করে, যাহা কিছু এই জয় একদিন এক বৎসর অথবা দশ বৎসর আগাইয়া দেয় তাহাই মৃত্যুর অঙ্গ। যৌনসম্ভোগ বিশেষত অতিরিক্ত যৌনসম্ভোগ মৃত্যুরই অঙ্গ।

যাহারা আমার কথা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাহারা যেন Charles S. Minot লিখিত The Problem of Age Growth and Death নামক বহুতথ্যপূর্ণ সুন্দর গ্রন্থখানি পাঠ করেন। এই পুস্তকের লেখক ধ্বংস এবং মৃত্যুর শরীরতত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। এই পুস্তকখানি ডাক্তারি বই নহে, ইহা সাধারণের বোধগম্য কয়েকটী বক্তৃতার সমষ্টিমাত্র, এজন্য ইহাতে বিশেষ বিশেষ রোগের এবং যৌনবৃত্তির আলোচনা অল্পই আছে। যে তথ্যটির উপর আমি বিশেষভাবে জোর দিতে চাই তাহা এই যে, মৃত্যু পূর্ব্বোত্তর সম্বন্ধহীন একটি ঘটনামাত্র নহে পরন্তু ইহা একটি প্রবহমান ঘটনাধারা। কিন্তু যৌনবৃত্তি বিষয়ে লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে আমি যেটির মূল্য সকলের অপেক্ষা বেশী বলিয়া মনে করি সেটি হইল Dr. Kenneth Sylvan Guthrie লিখিত Regneration, the Gate of Heaven (অন্তর্জনন অথবা স্বর্গের দ্বার)। এই পুস্তকের নাম হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা প্রধানত আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে লিখিত, যদিও ইহাতে দৈহিক ও নৈতিক দিকগুলিরও বিশদ আলোচনা আছে এবং বহু বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রিক বাক্য প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, লেখক যৌনক্রিয়ার সহিত মৃত্যুর সম্বন্ধের উপর তেমন জোর দেন নাই, যদিও আমার প্রবন্ধের বর্ত্তমান অধ্যায়ের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

৫। মন

দেহের উচ্চতর ক্রিয়াসকল বিশেষ করিয়া মনের ক্রিয়া, যে সকল অঙ্গের সাহায্যে হইয়া থাকে, তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ করিলে জনন এবং অন্তর্জননের মধ্যে কতখানি নিশ্চল বিরোধ তাহা বুঝা যায়। দেহের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় ইচ্ছাপেক্ষক্রিয়াবান্ (মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডমূলক) এবং ইচ্ছানিরপেক্ষক্রিয়াবান্ এই উভয় প্রকার স্নায়ুমণ্ডলী যে সকল কোষের দ্বারা গঠিত, মূলে সেগুলিও বীজকোষ এবং নিগূঢ় প্রাণকেন্দ্র হইতে আহৃত। এই সকল কোষ অনবরত ভাগে ভাগে বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য স্নায়ুমণ্ডলীর বিভিন্ন গ্রন্থিপুটে যাইতেছে। বলা বাহুল্য বহুসংখ্যক কোষ সর্ব্বদা মস্তিষ্কেও যাইতেছে। এই সকল বীজকোষের অন্তর্জনন ক্রিয়া এবং ঊর্দ্ধমুখী গতিরোধ করিয়া তাহাদের জনন অথবা কেবল সম্ভোগের কার্য্যে নিযুক্ত করিলে অঙ্গ সকল তাহাদের ক্ষয়নিবারক প্রাণশক্তি হইতে বঞ্চিত হয় এবং ধীরে ধীরে শেষ পর্য্যন্ত নিস্তেজ হইয়া যায়। এই সকল শারীরিক তত্ত্ব হইতে যে যৌননীতি পাওয়া যায় তাহার বিধি—পূর্ণ সংযম, অন্তত পক্ষে পরিমিত সম্ভোগ। যাহা হউক সংযম নীতির মূল কোথায় তাহা দেখা গেল।

একটি উদাহরণ করুন। ভারতীয় দার্শনিকগণ বলিতেন সংযম মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করে। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের সহিত যাহারা সামান্য পরিচিত, তাহারা জানেন হিন্দুরা পূর্ব্বে তপস্যা করিত এবং এখনও কেহ কেহ করে। এই তপস্যার উদ্দেশ্য দুটি—শরীরের শক্তিরক্ষা ও বৃদ্ধি করা এবং অলৌকিক মানসিক শক্তি অর্থাৎ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। প্রথমটির নাম হঠযোগ। হঠযোগীরা কেবল দৈহিক পূর্ণতাকে লক্ষ্য করিয়া অসাধারণ শারীরিক শক্তিসকল লাভ করিয়া থাকেন। অপরটির নাম রাজযোগ; ইহার লক্ষ্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ

সাধন। তথাপি এই দুই প্রকার যোগের ভিতর একই শারীর-নীতি আছে। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ মানবতত্ত্ববিদ পতঞ্জলির যোগদর্শনে এবং তৎপ্রভাবান্বিত অন্যান্য গ্রন্থে ইহা উক্ত হইয়াছে।

যোগসাধনের যে সব বাধা আছে, রাগ তাহাদের মধ্যে তৃতীয় (২,৭)। পতঞ্জলি বলেন, সুখ অথবা সুখলাভের উপায় সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা অথবা ইচ্ছাকে রাগ বলে। সুখের সহিত দুঃখ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে বলিয়া যোগীর সুখ ত্যাগ করা উচিত (২,১৫)। এ পর্য্যন্ত যোগদর্শনে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কামবাসনার আলোচনা হইয়াছে; পরের সূত্রসকলে শরীর-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

যমের সাধনা যোগাভ্যাসের প্রথম ধাপ। যম পাঁচ প্রকার— অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, যাহারা যোগী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয় তাহারা হয় চতুর্থ যম কি তাহা জানে না অথবা তাহার কথা বলে না। ব্রহ্মচর্য্যই চতুর্থ যম।

পতঞ্জলি মুনির মতে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে যথেষ্ট লাভ হয়। তিনি বলেন, যিনি ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার বীর্য্য বা শক্তিলাভ হয়; বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধি তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি শ্রোতাদের অন্তরে তাঁহার নিজের চিন্তা অনুপ্রবেশ করাইতে পারেন। এরূপ দুর্লভ সিদ্ধি যাঁহার লাভ হয় তাঁহার মত সৌভাগ্য কাহার?

শ্রীযুক্ত মণিলাল দ্বিবেদী নামক বর্ত্তমান ভারতের জনৈক পণ্ডিত বলেন, "শরীরবিজ্ঞানের সুপরিচিত নিয়ম এই যে, বুদ্ধির সহিত শুক্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আমরা বলিতে পারি যে, আধ্যাত্মিকতার সহিতও শুক্রের এইরূপ সম্বন্ধ আছে। শুক্ররূপ অমূল্য বস্তুর অপব্যয় না করিলে

মানুষ শারীরিক শক্তি ও ঈপ্সিত আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করে। কোনো যোগ সফল করিতে হইলে প্রথমেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে।

যোগ সাধনের উদ্দেশ্য ও উপায় ভাষ্যকারগণ রূপকের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন উক্ত হইয়াছে, শক্তি সাপের মত নিঃশব্দে সর্ব্বাপেক্ষা নীচের চক্র (অণ্ডকোষ) হইতে উঠিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উপরের চক্রে (মস্তিষ্কে) যায়।

৬। ব্যক্তিগত সম্ভোগনীতি

সাধারণত, ব্যক্তি সমাজ বা জাতির অভিজ্ঞতা হইতে নীতিশাস্ত্র রচিত হয়। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে, অনেক সময় কোনো না কোনো মহাপুরুষ নীতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। মুসা, বুদ্ধ, কন্‌ফুসিয়াস, সক্রেটিস, এরিষ্টটল্ যীশুখৃষ্ট এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী মহান্ নীতিবিদ ও দার্শনিকগণ নিজ নিজ দেশে ও কালে মানবের আচরণের ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার করার জন্য মাপকাঠি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দর্শন, মনোবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের তথ্য সমূহই সাধারণ নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি। এজন্য কোনো যুগের লোকে নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে যে সব তত্ত্বের প্রভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেই যুগ বা সভ্যতার ব্যক্তিগত সম্ভোগনীতি সেই সব তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। সমাজিক সম্ভোগনীতির ন্যায় এই ব্যক্তিগত সম্ভোগনীতি যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু ইহার ভিতর এমন কিছু আছে যাহা অল্প-বিস্তর স্থায়ী।

বর্ত্তমান যুগের উপযোগী সম্ভোগনীতি নির্ণয় করিতে হইলে, সমস্ত জ্ঞাত ঘটনা ও সম্ভাবনার উপর (বিশেষভাবে যখন ইহারা বিচক্ষণ লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে) আমাদের নির্ভর করিতে হইবে। এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, ১ম হইতে ৫ম অধ্যায়ে আমি যে সব ঘটনা

উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে, সরল ও বুদ্ধিমান পাঠকের মনে কতকগুলি সিদ্ধান্ত না আসিয়াই পারে না। তাহা এই যে, শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবশ্য পালনীয়। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে শীঘ্রই আর একটি নিয়মও দেখা দেয়। আমরা দুইটি পরস্পরবিরোধী নিয়মের সম্মুখীন হইয়া পড়ি। পুরাতনটি প্রাকৃত, ইহাই আমাদের কামবাসনা উদ্রেক করে, নূতনটি অনুভূতি, বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা বিশ্বাস এবং আদর্শের ভিত্তির উপর স্থাপিত। পুরাতন নিয়মের পথে চলিলে অর্থাৎ কামবাসনা পূরণ করিলে ক্ষয় ও মৃত্যু আগাইয়া আসে; নূতন নিয়মের পথের বাধা এত বেশী যে, প্রায় কেহই এ পথে চলিতে চায় না—লোকে বিশ্বাস করিতেই চায় না যে ইহাই প্রকৃষ্ট পথ। এ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিলে, সে তৎক্ষণাৎ নানা ওজর আপত্তি দেখায়। যোগী ভিক্ষু এবং সন্ন্যাসীগণ যে কঠোর নীতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে বর্ণিত শরীরবিজ্ঞানের অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানই তাহার ভিত্তি; পৌরাণিক গল্প অথবা কুসংস্কার তাহার ভিত্তি নহে।

কাউণ্ট টলষ্টয় অপেক্ষা বেশী জোরের সহিত সম্ভোগনীতি সম্বন্ধে কোনো আধুনিক লেখক লেখেন নাই। নীচে তাঁহার কয়েকটি সিদ্ধান্ত দিতেছি।

১০২। বংশরক্ষার সংস্কার অর্থাৎ কামবাসনা মানুষের ভিতর প্রকৃতিগত। প্রাকৃত অবস্থায় এই বাসনা তৃপ্ত করিয়া সে বংশরক্ষা করে এবং ইহাতে তাহার সার্থকতা হয় মনে করে।

১০৩। জ্ঞান উন্মেষের সহিত মানুষ ভাবে, এই ইচ্ছা পূরণে তাহার ব্যক্তিগত লাভ; এবং বংশরক্ষার কথা না ভাবিয়া শুধু ব্যক্তিগত সুখের জন্য সে সম্ভোগে লিপ্ত হয়। ইহাই যৌন পাপ।*

* টলষ্টয়ের পাপের অর্থ একটু স্বতন্ত্র রকমের। যাহা সকলের প্রতি প্রেমের পরিপন্থী, টলষ্টয়ের মতে তাহাই পাপ।

১০৭। যখন মানুষ ব্রহ্মচর্য্য পালন ও নিজের সকল শক্তি ভগবানের সেবায় নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করে, তখন সম্ভোগমাত্রই তাহার পক্ষে পাপ বলিয়া গণ্য হইবে। সন্তান জন্মদানের ও পালন করার উদ্দেশ্যেও ইন্দ্রিয়সেবা তাহার পক্ষে পাপ। যে ব্যক্তি পূর্ণ সংযমের পথে চলা স্থির করিয়াছে, পবিত্র বিবাহও তার পক্ষে এরূপ পাপ।

১১৩। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যের পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছে বিবাহ করা তাহার পক্ষে এই জন্য পাপ (বা ভুল) যে, বিবাহ না করিলে সে সম্ভবত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাজকে জীবনের ব্রতরূপে নির্ব্বাচন করিত এবং ভগবানের সেবায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিত, ফলে প্রেমের প্রচারে ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলপ্রাপ্তিতেই তাহার শক্তির ব্যবহার হইত। কিন্তু বিবাহ করার জন্য সে জীবনের নিম্ন স্তরে নামিয়া আসে এবং নিজের মঙ্গলও সাধন করিতে পারে না।

১১৪। যে ব্যক্তি বংশরক্ষার পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছে, সন্তান উৎপাদন না করিলে অথবা অন্তত পক্ষে পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে সে দাম্পত্য-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিবে। ইহাই তাহার পক্ষে পাপ অথবা ত্রুটি।

১১৫। আর এক কথা, যাহারা সম্ভোগসুখ বাড়াইতে চেষ্টা করে, তাহারা যত অধিক কামাসক্ত হইবে, সম্ভোগের স্বাভাবিক আনন্দ হইতে তাহারা তত অধিক বঞ্চিত হইবে। প্রত্যেক কামনাতৃপ্তি সম্বন্ধেই ইহা খাটে।

পাঠক দেখিবেন, টলষ্টয়ের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষিক; অর্থাৎ তিনি বলেন নাই যে, ভগবান বা কোনো খ্যাতনামা গুরু মানুষের জন্য পাকা নিয়ম বানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া

বিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত ও প্রণীত গ্রন্থাবলী

মহাত্মা গান্ধী লিখিত

অনাসক্তিযোগ — ।৵০

হিন্দুধর্ম্মে যাহাকে অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলা হয় সেই গীতার নাম মহাত্মা গান্ধী কেন অনাসক্তিযোগ দিলেন এবং গীতার শিক্ষাকে পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করার জন্য চল্লিশ বৎসর ধরিয়া সতত চেষ্টা করার পর গীতার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর যে ধারণা হইয়াছে তাহা ইহাতে আছে। মূল গুজরাতীতে গান্ধীজী গীতার যে অনুবাদ ও ভাষ্য করিয়াছেন তাহার সুন্দর বাংলা অনুবাদ। গীতাকে ঠিক ভাবে বুঝিতে হইলে ইহা প্রত্যেকের পাঠ করা উচিত। ২৮০ পৃষ্ঠার উপর। সুন্দর কাগজ ও বাঁধাই।

ব্রহ্মচর্য্য — ॥০

দ্বিতীয় সংস্করণ। মহাত্মাজীর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বলিত।

প্রবাসী—ভাষা সুন্দর ও সুবোধ্য। অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও বহুপ্রচারযোগ্য।

প্রবর্ত্তক বলেন—মহাত্মার এই জীবন-বেদ তরুণ জাতির পক্ষে অমৃতস্বরূপ উপাদেয়। ইহা সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর অবশ্যপাঠ্য।

অস্পৃশ্যের মুক্তি — ৷৴০

মহাত্মাজী অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে যে সব আলোচনা করিয়াছেন তাহারই বাংলা অনুবাদ। ইহা যুগদেবতার বাণী—তাঁহার বজ্র-কঠিন আদেশ-মন্ত্র।

প্রবাসী—এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া বিনয় বাবু বাংলা দেশের উপকার করিলেন।

বিধবা বিবাহ — ৵১০

পঞ্চম সংস্করণ। বিধবাদের দুঃখমোচনের জন্য যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন এই সারবান যুক্তিপূর্ণ পুস্তক তাঁহাদের পাঠ করা কর্ত্তব্য—প্রবাসী।

দুর্নীতির পথে — ।৵০

লইবে; কেবল ইহা মনে রাখিতে হইবে, স্ব-নির্ব্বাচিত পথের নিয়ম যেন প্রত্যেকে পালন করে।

এরূপ নীতিশাস্ত্রে নিষেধের ক্রমনিম্ন ধাপ আছে। যে ব্যক্তি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যে বিশ্বাসী এবং উচ্চতর শারীরিক ও আত্মিক কল্যাণের জন্য যে বুদ্ধিমানের ন্যায় ইন্দ্রিয়সংযম করিতে ইচ্ছুক, সব রকম সম্ভোগ তাহার পক্ষে নিষেধ; যে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, পরপুরুষ বা পরস্ত্রীসঙ্গ তাহার পক্ষে নিষেধ। অধিকন্তু যে সব অবিবাহিতের অবাধ অথবা অনিয়মিত সম্ভোগ চলে তাহাদের পক্ষে বেশ্যাগমন আরও খারাপ; যাহারা স্বাভাবিক মৈথুনে লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহাদের অস্বাভাবিক মৈথুন ত্যাগ করা উচিত। পরিশেষে, প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের ভিতর যাহারা হাল ছাড়িয়া দিয়া চলে, অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়সেবা তাহাদের পক্ষে অনিষ্টকর। অপরিণতবয়স্ক এবং নব-যুবকদের ইন্দ্রিয়সেবা স্থগিত রাখা উচিত। ইহাই সম্ভোগনীতির স্বরূপ।

আমি ইহা ধারণাও করিতে পারি না যে, কোনো ব্যক্তি এই সম্ভোগ-নীতি বুঝিতে পারিবে না। যাহারা বিশেষভাবে ইহা চিন্তা করিবে, তাহাদের অতি অল্প লোকেই ইহার মূল্য অস্বীকার করিবে। তথাপি নানাপ্রকার কুতর্ক দ্বারা এইরূপ নীতির বিরোধিতা করার প্রবৃত্তি কাহারও কাহারও আছে দেখা যায়। লোকে ধরিয়া লয়, যেহেতু ব্রহ্ম-চর্য্য পালন করা কঠিন এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অত্যন্ত দুর্লভ, অতএব ব্রহ্মচর্য্যের সমর্থন করা ঠিক নহে। এইরূপ তর্ক অনুসারে নিজ পতি অথবা পত্নীতে অনুরক্ত থাকা অথবা দাম্পত্যজীবনে পরিমিত সম্ভোগ করা, কিংবা কেবল স্বাভাবিক মৈথুনে আসক্ত হওয়াও ঠিক নহে, কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলি পালন করাও দুষ্কর। একটি আদর্শ খর্ব্ব করিলে, সকল আদর্শই খর্ব্ব করা যায়, এবং ঘৃণিত পাপ ও কামবাসনার

পথ উন্মুক্ত হয়। একমাত্র খাঁটি ও তর্কানুমোদিত নিয়ম এই যে, আমরা আমাদের আদর্শকে ধ্রুবতারার ন্যায় চোখের সামনে রাখিয়া সর্ব্বদা পথ চলিব, ইহাই আমাদিগকে একের পর এক অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবে এবং বিরুদ্ধ শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া আমাদিগকে জয়যুক্ত করিবে। বুঝিয়া সুঝিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে এই পথে চলিবে, তার নিকট এ আশা নিশ্চয়ই করা যায় যে, সে নবযৌবনের অস্বাভাবিক মৈথুনের কিছু উপরে উঠিয়া স্বাভাবিক মৈথুনের আশ্রয় লইতে পারে, শেষোক্ত মৈথুন প্রথম প্রথম অবাধও হইতে পারে; এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে এবং নিজের ও সহধর্ম্মিণীর মঙ্গলের জন্য যতদূর সম্ভব সংযম রক্ষা করিতেও পারে। এই নীতি অনুসরণ করিয়া সে ব্রহ্মচারী পর্য্যন্ত হইতে পারে অথবা ভোগের কূপে ডুবিবার পূর্ব্বেই রক্ষা পাইতে পারে।

৭। কাম ও প্রেম

খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে ভালবাসা সম্বন্ধে বহু উপদেশ আছে। ইহাতে ভালবাসার দুইপ্রকার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে ইহার প্রত্যেকটি আলোচনা করিব। একটিকে কাম বলা হইয়াছে। কাম বলিতে বুঝায়—প্রাণের ও জগতের প্রাকৃত আকর্ষণ, স্ত্রীপুরুষের আসক্তি এবং যাহাতে সুখ অনুভূত হয় সেই সমস্ত ভাব ও বিষয়স্পর্শ। এই কাম আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়। মনে হয় মানুষের অপেক্ষা প্রবলতর শক্তিসকল মানুষকে সতত জীবনের দিকে টানিয়া আনিতেছে, তাহাদেরই বশীভূত হইয়া মানুষ কোথাও আকৃষ্ট হইতেছে, আবার কোথাও বিমুখ হইতেছে; মানুষের ক্রিয়াসকল প্রায়ই এই সকল শক্তিরই প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমাদের পছন্দ অপছন্দ, ভালবাসা বিদ্বেষ, শ্রদ্ধা

অশ্রদ্ধা লইয়া এই কাম-জগৎ সৃষ্টি হয়। কাম কি চায়? কাম চায় যাহার দাবী সে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রভাবে অনুভব করে সেই একের অর্থাৎ 'অহং'এর স্বার্থ। প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক বংশ, প্রত্যেক জাতির মধ্য দিয়া এই স্বার্থানুসন্ধান চলিতে থাকে—ইহার বেগ ও ক্রূরতা ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং পরিশেষে ইহা জগৎব্যাপী সমরে (যেমন সম্প্রতি হইয়াছে) পরিণত হয়। ইহা অসংখ্য বার রূপান্তর গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হয়, বুদ্ধির সহায়ে সহস্রপ্রকার যান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক উপায় অবলম্বন করে। বর্ত্তমানে ইহা আধুনিক সভ্যতারূপে মূর্ত্তিমান হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, প্রাণের এই প্রাকৃত আকর্ষণ অথবা কাম সম্বন্ধে খৃষ্টান ধর্ম্মের উপদেশ কি? ইহাকে কি তুচ্ছ, দমন কিংবা নির্ম্মূল করিতে হইবে? অথবা ইহার গতি অব্যাহত রাখিয়া ইহার উদ্দেশ্য সফল হইতে দিতে হইবে? কাম সম্বন্ধে যাবতীয় উপদেশ এই কয়টি সরল কথার মধ্যে পাওয়া যায়—"তোমাদের কি কি বস্তুর প্রয়োজন তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহা জানেন" এবং "প্রথমে তোমরা ঋত এবং স্বর্গরাজ্য লাভ করার চেষ্টা কর, এই সকল বস্তু তখন আপনা হইতেই তোমাদের হইবে।" কামকে নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, উহাকে শুদ্ধ করিতে হইবে। এরূপে খৃষ্ট-নির্দ্দিষ্ট উচ্চতর লক্ষ্যে পৌছিতে পারিলে 'পূর্ণতর জীবন' লাভ হইবে। তাহাতে শুদ্ধিকৃত কামের স্থান আছে।

এইখানেই আমরা আসল খৃষ্টীয়-প্রেমের সাক্ষাৎ পাই। বাইবেলে ইহাকেই (agape) প্রেম বলা হইয়াছে। কিসে ইহা কাম হইতে ভিন্ন তাহা আমাদের বুঝিতে দেরী হয় না। কামের অনমুরূপ এই প্রেম ব্যক্তির ইচ্ছাসাপেক্ষ। যাহা সাধারণ আকর্ষণ বিকর্ষণের উপরে ইহা সেই সপ্রেম করুণা। ইহা শত্রু মিত্র উভয়কে সমভাবে দেওয়া যাইতে পারে।

অতএব লোকে সাধারণত যাহা ভাবে খৃষ্টীয়-প্রেম সেরূপ নয়—ইহা দুর্ব্বলের ভাবাবেশ মাত্র নয়। স্বভাবতই ইহা ভাবাবেগের উপরে; এবং ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ছাড়া ইহা লাভ করা যায় না। আবার ইহা কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তিতে হয় না, ইচ্ছাশক্তির সহিত সাধুতা থাকা চাই। খৃষ্টান যখন এই প্রেম দান করে, তখন সে অপরের (eros) কামনাজাত আকাঙ্খাসমূহের সফলতালাভের সাহায্য করিয়া থাকে। ঈশ্বরের ন্যায় সেও তখন মানুষের কি কি বস্তুর প্রয়োজন তাহা জানে। কল্পনা এবং দয়াবৃত্তির দ্বারা সে অপরের প্রয়োজন সাধনে প্রণোদিত হয়, কারণ সে অন্যের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করে, অন্যের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে। সে জানে, যেমন তাহার তেমনি অপর সকলেরও প্রয়োজনের দাবী আছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম কামের দাবী অগ্রাহ্য করে না, পরন্তু প্রেমের উপর বেশী জোর দেয়। খৃষ্টীয় নীতিধর্ম্ম মানবকে একটি নূতন পথের সন্ধান বলিয়া দেয়, এবং তাহাকে স্বার্থানুসন্ধান হইতে বিশ্বের কল্যাণ সাধনায় নিয়োজিত করে।

প্রথম যুগের খৃষ্টানগণকে এই মূল্যবান সমন্বয় নীতির উপদেশ দেওয়া হয়। তবে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এবং অপার্থিব একটি আদর্শ তাহাদের দেখান হইয়াছিল। তাহা এই—মানুষকে ঈশ্বরের অনুকরণ করিতে হইবে। ঈশ্বর প্রেমে ও করুণায় যেমন পূর্ণ তাঁহার সেবকদেরও সেরূপ হইতে হইবে, কারণ "ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ"।

৮। সামাজিক সম্ভোগনীতি

যেমন ব্যক্তির সমষ্টি লইয়া সমাজ, সেইরূপ ব্যক্তিগত সম্ভোগনীতি হইতেই সামাজিক সম্ভোগনীতির উৎপত্তি। অন্য কথায়, সমাজ ব্যক্তিগত সম্ভোগনীতির সহিত কিছু জুড়িয়া ইহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে চায়।

ইহার মুখ্য উদাহরণ বিবাহপ্রথা। শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিবাহের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক-কিছু লিখিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে প্রচুর মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছেন। এজন্য আজকাল বিবাহ-প্রথায় যে পরিবর্ত্তনের কথা শুনা যাইতেছে, তাহার উল্লেখ করার সময় বৈজ্ঞানিক-দের সিদ্ধান্তের সারাংশ দেওয়া যাইবে।

মানবের মধ্যে সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে পিতার অপেক্ষা মাতার মহত্ত্ব অধিক। মাতাকে কেন্দ্র করিয়াই পরিবার গঠিত হয়। বাস্তবিক এক সময় মাতার শাসনবিধিই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং বহুপতিত্ব বা এক স্ত্রীর বহু পুরুষের সহিত মিলনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এশিয়ার কতকগুলি আদিম জাতির মধ্যে এখনও এই প্রথার জের বিদ্যমান আছে। স্বামীদের ভিতর যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান সুন্দর ও রক্ষাকার্য্যে সুনিপুণ ছিল, স্ত্রীর নিকট ধীরে ধীরে তাহার আদর বাড়িতে লাগিল এবং কালে স্বামীপদ সৃষ্টি হইল। ইংরেজী ভাষায় husband শব্দের অর্থ পতি অথবা গৃহপতি। husband শব্দ husbuondi শব্দ হইতে উদ্ভূত; husbuondi শব্দের অর্থ, যে ঘরে থাকে। এই একটি শব্দ বিবাহপ্রথার অনেক-কিছু ইতিহাসপূর্ণ। সকল পতির ভিতর হইতে যে পতি পত্নীর সহিত ঘরে থাকিত, তাহাকে স্বামী বা গৃহপতি বলা হইতে লাগিল। ক্রমে সে ঘরের মালিক হইল এবং গৃহপতি সম্প্রদায়ের কেহ কেহ সরদার বা রাজা হইল। নারীজাতির শাসনকালে যেমন বহুপতিত্ব চলিয়াছিল, পুরুষজাতির শাসন সুরু হইতেই বহুপত্নীত্ব চলিত হইল।

এজন্য সামাজিক ভাবে না হইলেও মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া স্ত্রী স্বভাবত বহুপতিত্ব এবং পুরুষ স্বভাবত বহুপত্নীত্ব পছন্দ করে। পুরুষ নিজের ইচ্ছায় চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী নারীর খোঁজ

করে, স্ত্রীও সেইরূপ সুন্দর পুরুষের খোঁজে ছুটাছুটি করে। যদি স্ত্রী-পুরুষের অবাধ, স্বাভাবিক এবং মানসিক বাসনার উপর কোনো লাগাম না থাকে, তবে কি প্রাচীন, কি আধুনিক সকল মনুষ্য-সমাজের নিশ্চয়ই নাশ হইবে। মনুষ্যেতর সব জানোয়ারের ভিতরও সন্তান-উৎপাদন বাসনার আতিশয্য আছে। ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সমাজ প্রথমত বিবাহপ্রথা এবং পরিশেষে এক-বিবাহপ্রথা আবিষ্কার করিয়াছে। স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলনই ইহার একমাত্র বিকল্প; এরূপ অবাধ মিলনের ফলে আধুনিক সমাজ ধ্বংস হইবে। এক-বিবাহপ্রথা ও অবাধমিলনের একটি সংগ্রাম চলিতেছে তা আমরা দেখিতেছি। বেশ্যাবৃত্তি, অনিয়মিত ও অবৈধ মিলন, ব্যভিচার ও তালাক দেখিয়া দিন দিন মনে হয় যে এক-বিবাহ প্রথা এখন পর্য্যন্ত পুরাতন ও আদিম সম্বন্ধ দূর করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে নাই। কোনো কালে কি পারিবে?

যাহা বহুদিন হইতে গুপ্তভাবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু হালে নির্লজ্জ-ভাবে মাথা তুলিতে সুরু কবিরাছে, সেই সন্তান-নিরোধ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এজন্য এমন সব ঔষধ ও যন্ত্রপাতির সাহায্য লওয়া হয় যাহাতে গর্ভসঞ্চার হইতে পারে না। গর্ভসঞ্চার হইলে অবশ্য নারীর উপর ভার পড়ে, কিন্তু ইহা পুরুষের প্রবৃত্তিকে বিশেষত দয়ালু পুরুষের প্রবৃত্তিকে অনেক সময় সংযত রাখে। সন্ততিনিরোধ প্রচলিত হইলে বিবাহিত জীবনে আত্মসংযম করার কোনো তাগিদ থাকে না, এবং যতক্ষণ ইচ্ছা না কমে অথবা ইন্দ্রিয় শিথিল না হয়, ততক্ষণ কামবাসনা তৃপ্ত করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া স্বামীস্ত্রীর উপর বিবাহিত জীবনের বাহিরেও ইহার প্রভাব পড়িতে পারে। ইহা অনিয়মিত, অবাধ এবং নিষ্ফল সম্ভোগের দরজা খুলিয়া দেয়—আধুনিক শিল্প, সমাজবিজ্ঞান এবং

রাজনীতির দৃষ্টিতে ইহা বিপদপূর্ণ। আমি ইহার খুঁটিনাটি আলোচনা এখানে করিতে পারি না। ইহা বলাই যথেষ্ট যে, সন্তাননিরোধের জন্য কৃত্রিম উপায়ের সহায়তা লইলে নিজের স্ত্রী বা পরস্ত্রীর সহিত অতি-মাত্রায় সম্ভোগের সুবিধা হয়, এবং এ পর্য্যন্ত শরীরশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে সব যুক্তি আমি পেশ করিয়াছি, তাহা ঠিক হইলে ইহাতে নিশ্চয়ই ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের অকল্যাণ হয়।

৯। উপসংহার

ক্ষেত্রে ছড়ান বীজের ভিতর অনুর্ব্বর অংশে পতিত বীজগুলি যেরূপ নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ এই প্রবন্ধ এমন কাহারও কাহারও হাতে পড়িবে যাহারা ইহাকে অবজ্ঞা করিবে, অথবা অযোগ্যতা বা তাহা অলসতার জন্য ইহা বুঝিবে না। যাহারা এই সব মত প্রথম প্রথম শুনিবে তাহাদের কেহ কেহ বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং ক্রুদ্ধ হইবে; কিন্তু কাহারও কাহারও নিকট ইহা সত্য ও উপযোগী মনে হইবে—ইহাদের অন্তরেও সন্দেহ থাকিবে। এই শ্রেণীর সর্ব্বাপেক্ষা সাদা-সিধা লোকে বলিয়া উঠিবে :— "আপনার যুক্তি অনুসারে ইন্দ্রিয়সেবা করা ঠিক নহে; তবে তো পৃথিবী জনশূন্য হইয়া যাইবে—ইহা অসম্ভব! অতএব আপনার যুক্তিতে গলদ আছে।" আমার জবাব এই, আমি এমন কোনো ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছি না, যাহাতে সৃষ্টি লয় হইবে। সন্তান-নিয়ন্ত্রণই সন্তানজন্ম বন্ধ করার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল পন্থা। ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা দ্বারা পৃথিবী যত শীঘ্র জনশূন্য হইবে আশঙ্কা করা যাইতেছে, সন্ততিনিয়ন্ত্রণ দ্বারা তাহা অপেক্ষা শীঘ্র জনশূন্য হইবে। আমার উদ্দেশ্য সরল; অজ্ঞান ও ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে কয়েকটি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য উপস্থিত করিয়া, এ যুগের স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ যাহাতে পবিত্র হয়, আমি তাহার সহায়তা করিতে ইচ্ছা করি।

পরিশিষ্ট (খ)

সংযম ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতা *

যৌন ব্যাপারটি বড় অদ্ভুত, কারণ যদিও ইহার সহিত আমরা সকলেই মুখ্য এবং গৌণরূপে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং আজ হউক কাল হউক সকল লোকেরই জীবনের এক সময় ইহা চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে. তথাপি আমরা পরস্পরের মধ্যে বিশেষতঃ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ইহার আলোচনা করি না, যেন সমগ্র মানবসমাজ এ বিষয়ে নীরবতার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। মানবজীবনের এই অত্যন্ত কৌতুকাবহ বিষয়টিকে অন্য সকল রহস্য অপেক্ষা আমরা গোপন করিয়া রাখিয়াছি। কোনো ধর্ম্ম বিষয়েও এতটা গোপনভাব অথবা সম্ভ্রম রক্ষিত হয় না। প্রেমের বাহিরের দিকগুলি লইয়া বাগাড়াম্বর করা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যেও যৌনব্যাপারের সুখ ও ভয়ভাবনাগুলি লইয়া সচরাচর বলাবলি হয় না। শেকার † (Shaker) সম্প্রদায় এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে মুখে বলিয়া যত না ইহাকে বাড়াইয়া তোলে, সমস্ত মানবসমাজ এ বিষয়ে নীরব থাকিয়া ইহাকে তাহার চেয়ে বেশী বাড়াইয়া তুলিয়াছে। অবশ্য কিছু বলার মত না থাকিলে এ বিষয়ে অথবা কোনো বিষয়েই কেবল কথা কহিয়া কোনো লাভ নাই। কিন্তু এই বিষয়ে প্রকৃত আলোচনার অভাব দেখিয়া বলা যায় যে এদিকে মানুষের শিক্ষা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে।

---

* হেনরী ডেভিড থরোর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' হইতে (From *Essays* by Henry David Thoreau.)

† ইংলণ্ড ও আমেরিকার ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ। বৈষ্ণবদের মত নর্ত্তন ইহাদের উপাসনার অঙ্গ।

মানবসমাজ যদি শুদ্ধ হইত, তবে বিবাহ ব্যাপারটির আলোচনা লজ্জা করিয়া (সম্ভ্রম হেতু নয়) এত এড়াইবার চেষ্টা থাকিত না, চোখঠারা অথবা ইঙ্গিত মাত্র করা হইত না। ইহার স্বাভাবিক ও সহজ আলোচনা হইত। যদি এড়াইবার দরকার হইত, তবে সমশ্রেণীর অপরাপর রহস্যগুলির ন্যায় ইহাকেও সহজ ভাবে এড়ান হইত। যদি লজ্জার জন্য এই বিষয়ে মুখের কথাও না বলা যায় তবে মানুষ এ কাজ কি করিয়া করে? কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, উপরে উপরে যে পরিমাণ পবিত্রতা অথবা অপবিত্রতা দেখা যায় ভিতরে দুইই তাহার চেয়ে বেশী আছে।

সাধারণত লোকে বিবাহের সহিত খানিকটা ইন্দ্রিয়লালসা যুক্ত করিয়া ভাবে; কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রত্যেক প্রেমিকই বিবাহের পরিপূর্ণ শুদ্ধতায় বিশ্বাস করে।

যে বিবাহ পবিত্র-প্রেমের ফল সে বিবাহের মধ্যে ইন্দ্রিয়লালসার স্থান নাই। পবিত্রতা অস্ত্যাত্মক, নাস্ত্যাত্মক নয়। বিশেষভাবে ইহা বিবাহিতেরই ধর্ম্ম। পবিত্র দাম্পত্যজীবনে উচ্চতর আনন্দসকল কামবাসনা এবং নিম্নশ্রেণীর সুখের স্থান অধিকার করিবে। যাহারা মহৎ ভাব লইয়া মিলিত হয়, তাহারা নীচ কাজ কিরূপে করিতে পারে? অপর যে কোনো কর্ম্মের চেয়ে প্রেমজ কর্ম্ম সুন্দর হইবে ইহাই স্বাভাবিক, কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে পরস্পরের শ্রদ্ধা, যাহা উভয়কেই সর্ব্বক্ষণ পবিত্রতর এবং উচ্চতর জীবনযাপনে উৎসাহিত করিতেছে। পরস্পরের সহযোগে স্বামী-স্ত্রী যে কাজ করিবে, তাহা নির্দ্দোষ ও পবিত্র হওয়া চাই, কারণ পবিত্রতার চেয়ে বড় আর কিছুই নাই। এ ব্যাপারে আমাদের যাহাকে লইয়া কারবার তাহাকে তো (অর্থাৎ স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে, এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে) আমরা নিজেদের অপেক্ষা অধিক

শ্রদ্ধা করি। অতএব কার্য্য করিবার সময় আমরা ভাবিব, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে রহিয়াছি। প্রেমিকের মনে প্রেমাস্পদের চেয়ে কে বেশী সম্ভ্রম উদ্রেক করিতে পারে?

শরীরের উত্তাপ বাড়াইবার জন্য কুকুর বিড়াল এবং অলস প্রকৃতির লোকে যে ভাব লইয়া আগুণ পোহায়, যদি সেই ভাব লইয়া স্নেহের আকাঙ্ক্ষা কর তবে তুমি নিম্নগামী হইতেছ এবং ক্রমশঃ গভীরতর আলস্যের কূপে নিমগ্ন হইবে। সেই আগুণের উত্তাপের অপেক্ষা তুষারাবৃত পৃথিবী হইতে বিচ্ছুরিত সূর্য্যালোকের উত্তাপ শ্রেয়। স্বর্গীয় প্রেমের অমৃত পানে মানুষ শিথিলাঙ্গ হয় না, বরং তাহাতে মানুষের শক্তিসঞ্চার হয়। দেহকে যদি চাঙ্গা করিতে চাও তবে ব্যায়াম কর, আগুণের মালসা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিও না। আত্মনির্ভরশীল হইয়া মহৎ কর্ম্ম দ্বারা চিত্তকে সতেজ রাখ, অপরের সহানুভূতির অপেক্ষা করা মহত্তের পথ নয়। দৈহিক জীবনের সহিত প্রত্যেকের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সামঞ্জস্য থাকা চাই। যেমন কঠিন শয্যায় শোয়া উচিত, তেমনি যদি নির্ভর করিতে হয় তবে কঠিনবক্ষ বন্ধুর উপর নির্ভর করিবে। ঠাণ্ডা জল ভিন্ন কিছু পান করিবে না। যাহা শুনিবে তাহা যেন বিশুদ্ধ প্রাণদায়ী সত্য কথা হয়। মধুর এবং অতিরঞ্জিত বাক্য শুনিবে না। শীতল নির্ঝর বারির ন্যায় সত্যে অবগাহন করিবে, বন্ধুদের সহানুভূতি দ্বারা উষ্ণ করা জলে নয়।

প্রেমের সহিত কি কোনো ভাবে উচ্ছৃঙ্খল ভোগের সম্বন্ধ থাকিতে পারে? স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে ভোগ না করিয়া প্রেমসাধনা করিবে। প্রেম হইতে কাম বহু দূরে। একটি ভাল, অপরটি মন্দ। প্রেমিকযুগল যখন তাহাদের চরিত্রের উচ্চতর ভাবের দিক দিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করে তখন জাগে প্রেম। কিন্তু চরিত্রের নিকৃষ্ট ভাবের দিক দিয়া

আকর্ষণের ভয়ও আছে, সেরূপ হইলেই সেখানে কামের উৎপত্তি হয়। ইহা ইচ্ছাকৃত এমন কি জ্ঞাতসারে নাও হইতে পারে। কিন্তু নিবিড় প্রেমালিঙ্গনের সময় পরস্পরকে দূষিত করার ভয় থাকে, কারণ মানুষ যখন আলিঙ্গন করে তখন নিজের সম্পূর্ণ দেহ মন দিয়াই করে।

আমাদের প্রেমাস্পদের চিন্তা যেন কখনও অপবিত্র চিন্তার সহিত যুক্ত না হয়। যদি আমাদের অজ্ঞাতসারেও অপবিত্রতা আসে, তবেই পতন হইল।

প্রেম যখন প্রেম-বিলাসে পরিণত হয় তখনই ভয়। শীতের প্রভাতের মত আমাদের প্রেমের মধ্যে একটা বীর্য্য একটা কাঠিন্য থাকা চাই। সকল ধর্ম্মেই পবিত্রতার একটা আদর্শ আছে, কিন্তু হায় মানুষ তাহা লাভ করিতে পারিতেছে না। আমরা ভালবাসিয়াও পরস্পরকে উন্নত না করিতে পারি; যে ভালবাসা আমাদের মধ্যে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে না, যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, সে ভালবাসা আমাদের অধোগতিরই কারণ। সতত দৃষ্টি রাখা চাই, যেন আমাদের সকলের চেয়ে মধুরতম এবং পবিত্রতম স্নেহবন্ধনের উপর কোনো দাগ না পড়ে। আমাদের ভালবাসা যেন এরূপ হয় যে, তৎপ্রণোদিত কোনো কাজের জন্য আমাদের পরে অনুতাপ করিতে না হয়।

ফুলসকলের কি অপরূপ বর্ণ ও গন্ধের বৈচিত্র্য! তাহারা তরুসকলের বিবাহ দেয়। মানুষের জীবনে যখন বসন্ত আসে, তখন আমরা রূপকের ভাষায় বলি তাহার বিবাহের ফুল ফুটিল, কিন্তু এই রূপকের সার্থকতা থাকে না যদি এই বিবাহ লালসাবর্জ্জিত এবং পবিত্র না হয়। ইন্দ্রিয়ভোগের সহিত যুক্ত হইয়া ভাষার কত গভীর রূপকোপযোগী শব্দেরই না অর্থহানি ঘটিয়াছে!

কুমারীকে পুষ্পকলির সহিত তুলনা করা যায়। অপবিত্র বিবাহের দ্বারা সে মলিন হইয়া যায়, পাপড়িগুলি খসিয়া যায়। ফুল যার প্রিয়, কুমারী ও পবিত্রতাও তার প্রিয়। ফুলের বাগান এবং বেশ্যালয়ে যে তফাৎ প্রেম ও কামে সেই তফাৎ।

J. Biberg নামক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "প্রাণী জগতে প্রকৃতি জননেন্দ্রিয়গুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লুক্কায়িত রাখিবার প্রয়াস করিয়াছে, যেন সেগুলি লজ্জার বিষয়; কিন্তু উদ্ভিদ জগতে তাহারা পরিদৃশ্যমান এবং যখন তরুসকলের বিবাহ হয় তখন পৃথিবীতে কি আনন্দধারা বহিয়া যায়! পৃথিবী বর্ণে উজ্জ্বল এবং গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠে, মধুমক্ষিকা, কীট পতঙ্গ ফুলের মধু ভাণ্ডার হইতে মধু এবং শুক্ররেণু হইতে মোম আহরণ করে। লিনিয়াস (Linnœus) ফুলের ঘরটিকে বলিয়াছেন বাসরঘর এবং পাপড়ির ভিতর দিকের আবরণটিকে বলিয়াছেন পরদা। এই ভাবে তিনি ফুলের প্রত্যেক অংশের বর্ণনা করিয়াছেন।

কে জানে হয়ত ফুল জগতেও অনেক দুষ্টাত্মা আছে, যাহাদের স্পর্শে ফুলের জ্যোতি ম্লান হইয়া যায়, যাহারা ফুলের গন্ধ অপহরণ করে এবং তাহাদের বিবাহকে পঙ্কে লিপ্ত করে! তাই বুঝি সকল ফুল সমান আনন্দ দেয় না! নীচু জমিতে বর্ষাকালে এক রকম ফুল ফোটে যাহার গন্ধ পূতিগন্ধের মত।

যৌন মিলন অপূর্ব্ব সুন্দররূপে আমি কল্পনা করি। এত সুন্দর যে তাহা স্মরণে থাকে না। ঠিক যেমনটি তেমনটি কিছুতেই ভাবিয়া মনে আনা যায় না। লোকে বলে জগতে দৈবীশক্তির প্রকাশ আজকাল আর হয় না। কিন্তু যতদিন জগতে প্রেম আছে, ততদিন সে কথা বলা চলে না।

প্রকৃত বিবাহ এবং সত্যদর্শনে কোনো ভেদ নাই। সত্য উপলব্ধির মধ্যে যে স্বর্গীয় অনির্ব্বচনীয় পাগলপারা আনন্দ আছে, তাহা প্রেমালিঙ্গনের আনন্দেরই অনুরূপ।

অমর মানবজাতি এইরূপ মিলনেরই ফল। জননীর গর্ভ অনন্ত সম্ভাবনার ভাণ্ডার।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে, পশুর ন্যায় মানুষের বংশও সুজনন বিদ্যার সাহায্যে উন্নত করা যাইতে পারে কিনা। আমি বলি আমাদের প্রেম পরিশুদ্ধ হউক, তাহা হইলেই সব হইবে। শুদ্ধ প্রেম জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া দিবে।

উন্নতি যদি উদ্দেশ্য না হয়, তবে জনন অন্যায়। কেবল সংখ্যাবৃদ্ধি প্রকৃতির বাঞ্ছিত নয়। পশুরা কেবল সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু মহৎপ্রাণ নরনারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা যেমন নিজেদের ছাড়াইয়া চলে, তেমনি তাহাদের সন্তানও তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা উন্নত হইবে। মানুষের পরিচয় তাহাদের সন্তানের ভিতর পাওয়া যায়।